

নন্দলাল ভট্টাচার্য

॥ ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ॥

লি[redacted]পক্ষে
বি· চক্রবর্ত্তী
৩০/১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

Amritasya Putrah
By
Nandalal Bhattacharyya

শুভ ১লা বৈশাখ রবিবার ১৩৬৬

ব্লক
মডার্ন আর্ট প্রেসেস

মুদ্রণে
করুণাময়ী প্রেসের পক্ষে
গৌরচন্দ্র মান্না
৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৬

ক'টি কথা

আকস্মিকতার মালায় গাঁথা মানুষের জীবন। মুহূর্ত আগেও যা ছিল অদৃশ্য, অচিন্তনীয় মুহূর্ত পরেই তা হয় বাস্তব। এটাই হয়ত বিধিলিপি—কিংবা ঈশ্বরের দুজ্ঞেয় লীলার এ এক মধুর প্রকাশ। এই লীলারঙ্গের এক অকিঞ্চিৎকর ঢেউ-এ ভেসে উঠেছে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'।

মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ—এ আপ্তবাক্য অজানা নয়, তবু কোন এক অলক্ষ্য ইঙ্গিত মানুষকে প্রবৃত্ত করে সহসাকর্মে। অমৃতস্য পুত্রাঃ রচনা বা প্রকাশনা দুয়েরই পেছনে রয়েছে ওই অলক্ষ্য অনন্য ইঙ্গিত। হয়ত এর পেছনে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন ইচ্ছা—নাহলে মাত্র অল্প কিছুদিনে এ জাতীয় একটি বই রচনা, প্রকাশনার নাম স্বাভাবিকতা নয়। অঘটন পটিয়সী যিনি—যাঁর জিনিস তাই তাঁরই ইচ্ছায়, আশীর্বাদে সম্ভব হ'ল এ প্রকাশনা। কোন কৃতিত্বের দাবিদার নই। দ্রুততা হয়ত গ্রন্থকে স্থানে স্থানে করেছে প্রমাদ কণ্টকিত। এ দায় ব্যক্তিগত, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

একান্তভাবেই মাধুকরী বৃত্তিতে গড়ে উঠেছে অমৃতস্য পুত্রাঃ'র অবয়ব। নানা গ্রন্থে, পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে যেসব কথা—কাহিনী তাকেই এক জায়গায় একসূত্রে গাঁথার এই প্রয়াস যদি কারো এতটুকু কাজে আসে, মন ভরায়, তবেই শ্রম সার্থক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের কাছে এসব তথ্য হয়ত অজানা নয়, কিন্তু এক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস এবং তার দশজন প্রেসিডেন্ট মহারাজের জীবন ও কর্মধারা প্রকাশের প্রয়াস হয়ত এই প্রথম। শ্রীরামকৃষ্ণই সংঘগুরুদের মধ্য দিয়ে হন প্রকাশিত, করিয়ে নেন কাজ, তারপর টেনে নেন নিজের কাছে। নেই তাঁদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। সত্য এই কথা। তবু যা ইতিহাসের উপাদান তাকেও বোধহয় রাখা দরকার সযত্নে—এই মানসিকতা উৎসাহিত করেছে এ গ্রন্থ রচনায়। যেসব বই থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে পাতায় পাতায় তার উল্লেখ করে একে করা হয়নি গবেষণার নিবন্ধ, বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে সাবলীলতা।

গ্রন্থ রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজ্য সাধু মহারাজ ও কর্মীরাও নানাভাবে সাহায্য করেছেন—এর অনুল্লেখ দায় বাড়াবে কৃতঘ্নতার।

কৃতজ্ঞ আরো বহুজনের কাছে—তাই নাম নয়, শুধু শেষ করছি—সবারে আমি নমি॥

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

উৎসর্গ

সেজমামা

শ্রীশ্যামপদ ভট্টাচার্য-কে



অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ



পরমাপ্রকৃতি শ্রীমা সারদাময়ী



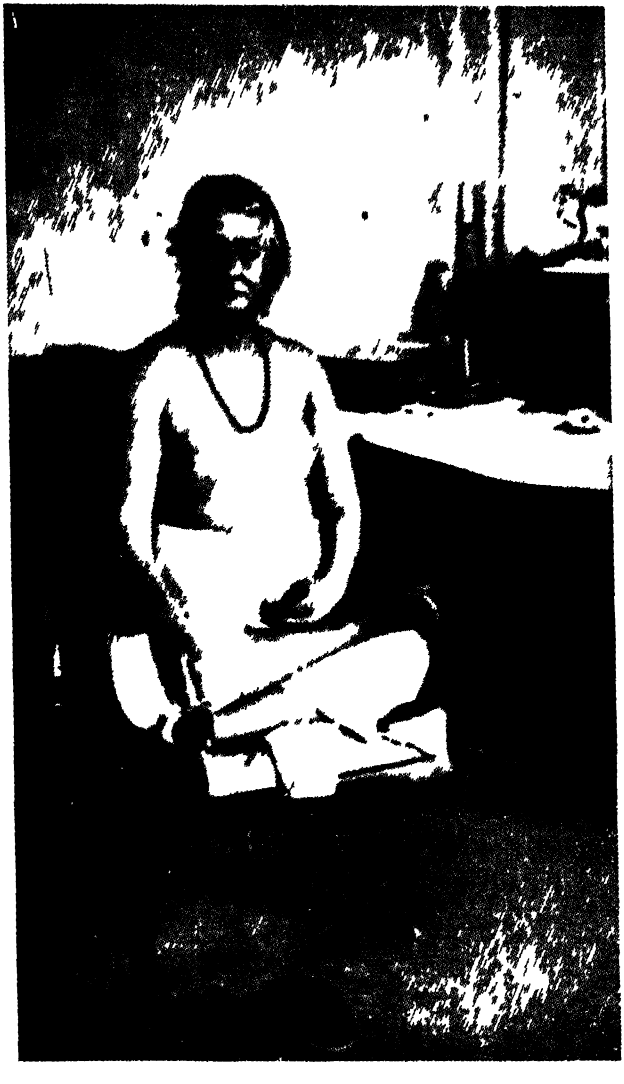
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ



স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাজা মহারাজ)



স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ)



স্বামী অখণ্ডানন্দ   গঙ্গাধর মহারাজ



স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বিজ্ঞান মহারাজ



স্বামী শুদ্ধানন্দ (সুধীর মহারাজ)



স্বামী বিরজানন্দ



স্বামী শঙ্করানন্দ (অমূল্য মহারাজ)



স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (জ্ঞানেন মহারাজ)



স্বামী মাধবানন্দ (নির্মল মহারাজ



স্বামী বীরেশ্বরানন্দ (প্রভু মহারাজ)



প্রতীকের অর্থ

The wavy waters in the picture are symbolic of Karma, and Lotus of Bhakti, and the rising sun of Jnana. The encircling serpent is indicative of Yoga and awakened Kundalini Shakti, while the swan in the picture stands for the Paramatman (Supreme Self). Therefore the idea of the picture is that by the union of Karma, Bhakti, and Yoga, the Vision of the Paramatman is obtained.—Swami Vivekananda

[ছবির তরঙ্গায়িত জলরাশি কর্মের প্রতীক। পদ্ম ভক্তির, উদিত সূর্য জ্ঞানের, সর্প বেষ্টনীটি যোগ ও জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির এবং হংস হচ্ছে পরমাত্মার প্রতীক। সুতরাং ছবিটির অর্থ—কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের সম্মিলন হলেই দেখা পাওয়া যায় বা মিলন ঘটে পরমাত্মার সঙ্গে।]

প্রাক্‌কথন



কারুণ্যপুণ্যনিলয়ং যুগধর্মনিষ্ঠং।
দীনার্তদুঃখিশরণং ভজ রামকৃষ্ণম্‌॥

১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট রবিবার। নিকষকালো অন্ধকার রাত। মানুষ তখন ঢলে পড়েছে সুষুপ্তির কোলে। ঘুম নেই শুধু একটি ঘরে। কয়েকটি মানুষ তখন গুনছে ক্ষণ মহাবিচ্ছেদের—আবার মহামিলনের প্রতীক্ষায়। নিষ্কম্প প্রদীপ শিখা মাঝে মাঝেই উঠছে কেঁপে—এই বুঝি নেভে। শঙ্কাকুল মুখে চেয়ে থাকে মানুষগুলি।

এল শেষের সেই মুহূর্ত। ধ্বনিত হ'ল নাদ—ওম্‌। উচ্চারিত হ'ল দু'টি শব্দ—কালী। কালী। তারপরই মহাসমাধিতে মগ্ন হলেন অবতারবরিষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। এতক্ষণ যাঁরা ছিলেন স্তব্ধ, তাঁরা পড়লেন ভেঙে।

সেই ভাঙার মুহূর্তেই তাঁরা অনুভব করলেন আলোর স্পর্শ—তাঁদের সেই আলোকিত হৃদয়ে তখন বিরাজমান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। চোখের সামনে যে আলো হল নির্বাপিত—সেই দীপ জ্ব'লে উঠল হৃদয়ে। নবচেতনায় চৈতন্যময় হলেন তাঁরা। উদ্বোধিত হলেন নতুন সাধনায়, নতুন কর্মপ্রেরণায়।

তারও আগে যখন ঠাকুরের স্থূলদেহে রয়েছে প্রাণের স্পন্দন—সেই মুহূর্তে তাঁরই শিয়রে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ—উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দের সংশয় সঙ্কুল চিত্তে উঠেছিল সেই চরম জিজ্ঞাসার বিজলী রেখা— মনে মনে তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে এই মুহূর্তেও তিনি যদি বলেন—তিনি অবতার—তাহলে চিরতরে দূর হবে তাঁর সংশয়—আজীবন তিনি সেই প্রত্যয়ে স্থির থেকে করে যাবেন কাজ—বলবেন তিনি অবতার—তিনি অবতার।

নরেন্দ্রনাথের সেই নীরব ভাবনার উত্তর দিতে সেই মুহূর্তে সরব হলেন ঠাকুর।

ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট সে স্বর—জগতের মানুষের উদ্দেশ্যে সেই তাঁর শেষ বাণী—"নরেন এখনো অবিশ্বাস! যে রাম—যে কৃষ্ণ এই দেহে সেই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ—বেদান্তের দৃষ্টিতে নয়, সত্য সত্যই অবতার।"

দূর হ'ল সংশয়—চিরতরে।

তারপর—

যাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল এতগুলি জীবন—সেই সূর্য যখন গেল অস্তাচলে—তখন কি করবে এই মানুষগুলি?

এ প্রশ্ন, এ জিজ্ঞাসা যখন বিদ্ধ করছে জনে জনে—তখনই অন্তরে তাঁরা অনুভব করলেন তাঁর উপস্থিতি—তিনি আছেন, তিনি আছেন—আছেন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই।

এই চেতনা, এই বোধে তাঁরা হলেন স্থিতধী। আশ্বস্ত। ঠাকুরের রোগভোগের ওই দিনগুলিতে তাঁরা কয়েকজন ছিলেন তাঁর খুবই কাছাকাছি। সেবায়, নিষ্ঠায় তাঁরা তাঁদের প্রভুর রোগজীর্ণ দেহটাতে দিতে চেয়েছিলেন শান্তির প্রলেপ। আর প্রভু তাঁদের, ঠাকুর তাঁদের, জীবন দেবতা তাঁদের সেই মুহূর্তগুলিতে দিয়েছিলেন সেই পরম শিক্ষা, দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণভাব আন্দোলন প্রতিষ্ঠার দীক্ষা। কাশীপুরের সেই উদ্যান বাটীতে ঠাকুর তাঁদের ১১জনের অঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন গৈরিক বস্ত্র, হাতে দিয়েছিলেন ভিক্ষার পাত্র। সেদিন তাঁর সেইসব বালকভক্তকে রক্ষার ভার তিনি তুলে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রের ওপর। বলেছিলেন, নরেন, আমার এইসব ছেলেরা রইল। তুই সবার চেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, ওদের তুই রক্ষা করিস, সৎপথে চালাস, আমি শিগগিরি দেহত্যাগ করব।

আবার এক রাতে নরেনকে ডেকে ঠাকুর বলেন, বাবা আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম। তুই এদের দেখিস।

প্রভু—গুরু—ঠাকুরের এই নির্দেশ তিনি স্থূলদেহে অবর্তমানের পরও ধ্বনিত হচ্ছিল তাঁর ওইসব ভক্তের মনে। তাই আর সব সাধারণ ভক্ত যখন ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ভাবছিলেন ওইসব বালক ভক্তের দল এইবার ফিরে যাবে যে যার ঘরে তখন তাঁরা কিন্তু দৃঢ় হচ্ছিলেন এক নতুন সংকল্পে। তাঁদের অন্তরে তখন ধ্বনিত হচ্ছে ঠাকুরের সেই কথা,—শিবজ্ঞানে কর জীবসেবা।

ঠাকুর ছিলেন নানা পথের পথিক। হিন্দু, খৃস্টান, ইসলাম—সব পথের সাধনা শেষে তিনি বলেছিলেন—যত মত তত পথ। সব পথই মিলেছে গিয়ে সেই একে। একই পুকুরের এক এক ঘাটের জল নিয়ে কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ ব

বলে ওযাটার। আদতে সেই এক জল—। ঈশ্বরও ঠিক সেই এক। ডাক তাঁকে নানা নামে, চল নানা পথে সবশেষে সব নাম—সব পথ শেষ হবে সেই একে।

ঈশ্বর উপলব্ধির এক নতুন পথের সম্ভাবনার কথা তিনি উডিযে দেননি, এক নতুন সম্প্রদায গডাযও ছিল না তাঁর বাধা। কিন্তু বলেছিলেন, প্রতি ধর্মে, প্রতি পথে রযেছে যে পরম সত্য—তা চিরস্থাযী—চিরভাস্বর। সব ধর্মের মূল কথাই সেই সত্য। নেতি নেতি নয়, ইতি ইতি। তিনি আছেন—তাঁকে পাওযা যায-তাঁকে পাবে। এই হ'ল তাঁর জীবনদর্শন।

পাপ আর পাপী—বারবার কেন একই কথা। মন ফেরাও ঈশ্বরের দিকে। ডাকো তাঁকে—পাপ যাবে দূরে। কেন ভাববে নিজেকে পাপী। অন্তরে সদাবিরাজিত রযেছেন যে ঈশ্বর তিনি কখনও হতে পারেন পাপী—অথবা তাঁরই সান্নিধ্যে থেকে মানুষ হতে পাবে পাপী। শুধু ডাক তাঁকে, ভাব তাঁকে।

হাঁ৷ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু মনে রেখো নারী হ'ল জগজ্জননীর অংশ—সেই জননীসদৃশা—নারীকে ভক্তি কর। শ্রদ্ধা কর, সম্মান কর, পূজা কর। এই ছিল ঠাকুরের কথা।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ—এই চারপথেই পাওযা যায তাঁকে। সাধারণ মানুষ যারা, তারা অনুসরণ করুক নারদীয ভক্তির পথ। নামে রুচি, জীবে দযা, বৈষ্ণব পূজন। এই পথেই হবে ঈশ্বরের সাম্রাজ্য লাভ। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার রঙে রাঙাতে হবে সব কিছুকে। তাই নিযে যাবে মানুষকে প্রকৃত প্রেম—প্রকৃত সত্যের কাছে। ভালবাসা না থাকলে সত্যের জন্য করা যায না অন্তহীন সন্ধান। যুক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তি ছাড়া ভক্তি—তাও যে শুধু আবেগ তাড়িত এক বৃত্তিমাত্র। তাই আধ্যাত্মিক সিদ্ধির রযেছে যে চারটি শ্রেণী তাদের মধ্যে ঘটাতে হবে সমন্বয়। সমন্বযই ঘটাবে ঈশ্বরে মানুষে মিলন, মানুষকে মিলাবে মানুষের সঙ্গে।

লক্ষ্য যদি থাকে স্থির, তবেই ধ্যানে আসবে পূর্ণতা, আত্মার যোগ হবে পরমাত্মার সঙ্গে। জীবে সেবা ভাল কিন্তু তার সঙ্গে যদি না থাকে ঈশ্বর উপলব্ধির বাসনা তবে সে সেবা পরিণত হবে শুধুই সমাজ সেবায়। এক হাতে করতে হবে কাজ, অন্য হাত রাখতে হবে ঈশ্বরের চরণে—সব কর্ম নিবেদন করতে হবে সেই ঈশ্বরে।

ঠাকুরের এইসব উপদেশ ভাবিয়ে তোলে তাঁর বালক ভক্তদের। যাঁরা গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিযে চান ঈশ্বরের দর্শন, চান ঠাকুর নির্দেশিত পথে চলতে, প্রতিপদে তাঁদের ভাবনাকে আলোড়িত করে ঠাকুরের কথা—নির্দেশ—জীবনচর্যা।

সাকার—নিরাকার দুই রূপেই সাধনার কথা বলেছেন ঠাকুর। আবার ওই সঙ্গেই তুলেছেন ছোট্ট একটা সহজ সরল প্রশ্ন—যদি মূর্তিকে পূজা করা যায় তবে কেন যাবে না মানুষকে পূজা করা? শুধু চোখ বুজলেই তাঁকে দেখা যাবে, চোখ খুললে নয়—এই বা কেমন কথা? ঈশ্বর বিরাজিত রয়েছেন সর্বভূতে—সর্ব অবস্থায়। মন চাইলেই করা যায় ঈশ্বরের দর্শন।

একি শুধুই কথা? তা তো নয়, ঠাকুর যে নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই সত্যকে। রানী রাসমণির জামাই মথুরানাথকে নিয়ে ঠাকুর বেরিয়েছেন তীর্থসন্দর্শনে। দেওঘরে পৌঁছে দেখলেন প্রায়নগ্ন, কঙ্কালসার কিছু মানুষকে। কেঁদে উঠল প্রেমের ঠাকুরের হৃদয়। মথুরানাথকে বললেন, এদের দাও কম্বল, খাদ্য। বিষয়ী মথুরানাথ বললেন তীর্থযাত্রার এই তো শুরু, এখনই যদি এত খরচ করা হয় তবে হয়ত অর্থের অভাবে সম্পূর্ণ হবে না তীর্থযাত্রা। তাই এখন থাক।

ঠাকুর বলেন, তবে থাক তীর্থযাত্রাও। কাজ নেই আমার শিবদর্শনে। বসলাম এই পীড়িত লাঞ্ছিত মানবাত্মার পাশে, হতদরিদ্র এই মানুষগুলিরই মাঝে। প্রমাদ গনলেন মথুরানাথ। রাজী হতে হ'ল তাঁকে ঠাকুরের কথায়।

একি শুধু একবার। রানীর জমিদারি দেখতে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত তাঁর প্রজাদের। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, খাজনা মকুব করে দাও এদের। তাই করতে হ'ল মথুরানাথকে।

এক সময় ঠাকুর জিজ্ঞেস করেছিলেন ভবিষ্যতের বিবেকানন্দ, সেদিনের নরেন্দ্রনাথকে—তোর জীবনের লক্ষ্য কি? নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শুকদেবের মত নির্বিকল্প সমাধি।

শান্ত ঠাকুরের চোখ জ্বলে উঠল ভৎ'সনায়, কি, কোথায় তুই হবি বট গাছের মত বিশাল, তোর ছায়ায় আশ্রয় পাবে কত মানুষ, তা না তুই স্বার্থপরের মত চাইছিস—শুধু নিজের মুক্তি!

ঠাকুরের অবর্তমানে সেইসব কথাই যেন মনে পড়ে তাঁর ভক্তদের। মনে পড়ে ঠাকুরের সেই জীবন কথা। আজীবন সাধনার মধ্য দিয়ে যা পেয়েছিলেন তিনি তাই তিনি বিলিয়ে দিতে চান। কিন্তু কেমন করে বিলোবেন? এল ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ। ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ঘটল ঠাকুরের মিলন। সেই প্রথম দর্শনের পর থেকে কেশবচন্দ্র প্রায়ই আসতে লাগলেন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে। একে একে আসতে থাকেন রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভক্তেরা। ১৮৮০ সাল থেকেই

আসতে থাকেন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইয়ংবেঙ্গলের দল। ঠাকুরের মনোবাসনাও হ'ল পূর্ণ। নিজে যা পেয়েছিলেন তাই তিনি সঞ্চারিত করতে থাকেন তাঁর ওইসব নবীন ভক্তের প্রাণে। তাঁদের অন্তর্লোকে ঘটল বিবর্তন। সেই বিবর্তিত ভক্তের দল ঠাকুরকে হারিয়ে হয়ত সাময়িকভাবে কিছুটা বিভ্রান্ত। এবার কি হবে? তবে ভরসা নরেন্দ্রনাথ আছেন—যাঁকে ঠাকুর করে গেছেন তাঁদের নেতা—তিনিই দেখাবেন তাঁদের পথ।

শুরু হ'ল কথা। ঠাকুর যা বলে গেছেন, করে গেছেন—তাঁর সেই চিন্তাধারা—সেই উপলব্ধির কথা ছড়িয়ে দিতে হবে প্রাণে প্রাণে। প্রচার করতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসৃত পথের কথা। প্রচার করতে হবে তাঁর উপদেশ।

কিন্তু উদ্যোগের শুরুতেই কালো ছায়া ফেলে অর্থের চিন্তা। টাকা ছাড়া তো হয় না একাজ। কোথায় টাকা পাওয়া যাবে? ভক্তদের এই ভাবনারও অবসান করলেন ঠাকুর নিজেই—অলক্ষ্যে থেকেই। ঠাকুরের এক ধনী শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁকে বলছেন, ওরে এমন একটা জায়গার ব্যবস্থা তুই কর, যেখানে আমার এই বালক ভক্তরা থাকতে পারে, আসতে পারে বয়স্ক ভক্তরা, করতে পারে সবাই মিলে ঈশ্বরের নাম গান। এই স্বপ্নদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ছুটে গেলেন নরেন্দ্রনাথের কাছে। বললেন, ভাই তুমি একটা জায়গা ঠিক কর। খরচ যা হবে সব আমি দেব।

শুরু হ'ল খোঁজাখুঁজি। শেষে বরানগরে প্রায় পরিত্যক্ত একটা ভাঙা বাড়ি তাঁরা ভাড়া নিলেন মাসিক ১১ টাকায়। সময়টা সম্ভবত ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ। সেই বাড়িতে নিয়ে আসা হ'ল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষের কিছুটা। এর আগেই অবশ্য কিছুটা ছাই নিয়ে রামচন্দ্র দত্ত তাঁর কাঁকুড়গাছির বাগান-বাড়িতে তা করেছিলেন সমাধিস্থ। বরানগরেই স্থাপিত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের মঠ। বরানগর মঠই দেখা দিল ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বীজরূপে।

বরানগর মঠে একে একে জমা হতে থাকলেন ভাবী সন্ন্যাসীরা। কিন্তু তখনও সেখানকার আর্থিক অবস্থা ছিল এতই খারাপ যে বিবেকানন্দ সে কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, ওখানকার অবস্থা দেখে ভূতও পালিয়ে বেঁচেছিল।

অবস্থা যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ কয়েকজন বালকভক্ত কিন্তু সেখানেই থেকে গেলেন। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরের শেষে তাঁরা গেলেন হুগলী জেলার আঁটপুরে। স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরামের জন্মস্থান এই আঁটপুর। সেটা বড়দিনের সময়।

নরেন্দ্রনাথ সবাইকে শোনাচ্ছিলেন খৃস্টের কথা, তাঁর পুনরুজ্জীবনের কাহিনী। বলছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। সেইসব কথা কাহিনীতে অনুপ্রাণিত তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বসেই নেন সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প। সেই দলে তখন ছিলেন নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর এবং সারদা। বরানগরে ফিরে তাঁরা পরিধান করলেন গৈরিক বসন। স্বামী অভেদানন্দের লেখা থেকে জানা যায় সেটা ছিল ১৮৮৭ সালের জানুযারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। গৃহজীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে তাঁরা নিলেন নতুন বেশ, নতুন নাম। নরেন্দ্রনাথ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, নিরঞ্জন হলেন নিরঞ্জনানন্দ, শশী রামকৃষ্ণানন্দ, শরৎ সারদানন্দ, রাখাল ব্রহ্মানন্দ, সারদা ত্রিগুণাতীতানন্দ, বাবুরাম প্রেমানন্দ এবং কালী হলেন অভেদানন্দ। এর প্রায় পরে পরেই সন্ন্যাস নিযে তাবক হন শিবানন্দ, হরি তুরীয়ানন্দ, লাটু অদ্ভুতানন্দ, যোগেন যোগানন্দ, গোপালদাদা অদ্বৈতানন্দ, সুবোধ সুবোধানন্দ, গঙ্গাধর অখণ্ডানন্দ। এই তালিকার শেষ নামটি হরিপ্রসন্নের। তিনি হন বিজ্ঞানানন্দ। ১৮৯৬ সালে তিনি মঠে যোগ দিযে সন্ন্যাস নেন ১৮৯৮ সালে।

বরানগর মঠে তাঁরা কিন্তু স্থির হতে পারলেন না। আধ্যাত্মিকতার যে অরূপলোকের ডাক তাঁরা অনুভব করেছিলেন মনে-প্রাণে, সেই ডাকে সাড়া দিযে প্রায়ই তাঁরা চলে যেতেন দূরে—নির্জন কোন স্থানে ধ্যান আর সাধনার জন্য। কেটে যেত বেশ কযেকটা দিন, মাস, কখনও বা বছর। বিবেকানন্দও তখন যেন এক অস্থির ঘোড়ার সওযার। যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তাকে বাস্তবায়িত করা তখনও যে হয়নি তাঁর, পৌঁছতে পারেননি সাধনার সেই লক্ষ্যে।

অবশেষে ১৮৯১ সালে তিনি মঠ ছাড়লেন, বলে গেলেন তাঁর গুরুভাইদের, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি ততদিন আর ফিরব না। শুরু হ'ল পরিব্রাজকের জীবন। শুরু হ'ল ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পরিভ্রমণ। চলল শাস্ত্র পাঠ, চলল মানুষের মন জানার সাধনা, পুরণো মন্দির আর ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে দেশের ইতিহাস অনুধ্যানের পালা। বিবেকানন্দের সেই সময়কার দিনগুলি বিশ্লেষণ করে নিবেদিতা লিখেছিলেন, বিবেকানন্দের কর্মবীণার তন্ত্রী বাঁধা ছিল তখন শাস্ত্র, গুরু আর দেশমাতৃকা—এই তিনটি সুরে।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি তখনও বিবেকানন্দের হৃদয়ে সজীব। সেই অবস্থাতেই দেশের নারী সমাজ, সাধারণ মানুষের জীবন সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ শেষে তিনি পৌঁছোলেন কিছু সত্যে। তিনি বুঝলেন, জাতির জীবনের মূলে রয়েছে ধর্ম, কিন্তু

স যেন ঠাঁই করে নিয়েছে অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক অন্যায়, নির্যাতন ও শোষণের মধ্যে। তারই সুযোগ নিচ্ছে পুরোহিততন্ত্র, জাতপাতের প্রশ্ন তুলে ফয়দা তুলছে একটি শ্রেণী। বিবেকানন্দ বুঝলেন, এই অধঃপতন থেকে দেশকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় ধর্মের মূল সুরে কোন আঘাত না করে নারী ও সাধারণ মানুষের মুক্তিদান। সেই মুক্তিদান যজ্ঞের পুরোহিত হতে পারেন নিজের মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী এবং বিশ্বের সেবায় উৎসর্গীকৃত একদল সন্ন্যাসী। তাঁদের কাছে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছবি, মানুষের সেবা করাটা ঈশ্বরেরই আরাধনা—আর তারই মধ্য দিয়ে আসবে মুক্তি। স্বামীজীর ধ্যানধারণা পূর্ণ রূপটি প্রতিভাসিত হ'ল ভারত মহাসাগরে কন্যাকুমারিকার দক্ষিণে শেষ শিলাখণ্ডের ওপর। সেটা ছিল ১৮৯২ সালের বড়দিনের সময়। স্বামীজী ফিরে এলেন পূর্ণ চিন্তা, পূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে।

প্রশ্ন উঠবে, এক্ষেত্রে স্বামীজী কি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে করেছিলেন পুরোপুরি অনুসরণ? দেশ মাতৃকার এই পুনর্জাগরণ কি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত? শ্রীরামকৃষ্ণ তো সমাজ সংস্কারক ছিলেন না। তিনি বেঁচেছিলেন শুধুই ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বর সাধনাতেই কেটেছে তার দিন। সত্য এই কথা, কিন্তু তাঁর চারপাশে ঘটে যাচ্ছিল যেসব সামাজিক বিবর্তন তাও তো এড়িয়ে যায়নি তাঁর চোখকে। এড়িয়ে যায়নি বলেই তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কথায়। একটা সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শাস্ত্র ও ধর্মীয় অনুশাসনের কঠোর অনুগামী। যে সাম্য, সমানাধিকারের কথা রয়েছে শাস্ত্রে তাকে তিনি অনুসরণ করেছেন কাজে। তাই রাতের গভীরে যারা দীনের হতে দীন—সেইসব তথাকথিত নিচজাতির শৌচাগার তিনি নিজে করতেন ধৌত। মন্দিরে ভিখিরীদের ফেলে রেখে যাওয়া এঁটো পাতা নিজে করতেন পরিষ্কার। শুধু তাই নয়, সবরকম আত্মাভিমান বিসর্জন দিতে কোন কোন সময় সেইসব এঁটো পাতা থেকে খুঁটে খেতেন খাবার। জাতপাতের কোন বিচার তিনি করেননি, ভয় করেননি জাত হারাবার। পরবর্তীকালে ঠাকুর বলতেন ভক্তের কোন জাত নেই। একই ভাবে শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় লাটু মহারাজকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টায়, তাঁর বাণী প্রচারে 'ইয়ংবেঙ্গল'-দের সন্ধান করার মধ্যে। পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ জানিয়েছেন তিনি বনেদী পরিবারের দুই মহিলাকে আলমবাজারে তরি-তরকারি কিনতে পাঠিয়ে। অন্যদিকে ধর্মের কঠোর অনুশাসনের বিরুদ্ধেও ছিলেন তিনি। বিশ্বাস করতেন না নিরম্বু উপবাস ইত্যাদির মত কৃচ্ছ্রসাধনকে। বলতেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে মানসিকতা, এই যে কর্মধারা, তারই মধ্যে তো লুকিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের বীজ। স্বামীজী সক্রিয় রাজনীতি অথবা সমাজ সংস্কার আন্দোলনে কোনদিনই নামেননি, হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন তাঁর গুরুভাইদেরও। বলেছেন, রাজনীতি থেকে থাকবে শত হস্ত দূরে। কিন্তু ওইসঙ্গে সামাজিক অর্থ নৈতিক অবস্থার এক বিরাট প্রেক্ষাপট এঁকে তারই ওপর অধ্যাত্মসাধনার রঙে ছবি আঁকার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি তাঁদের। স্বামীজী তাকিয়ে ছিলেন সেইদিনের জন্য, যেদিন শিশু জন্মাবে আধ্যাত্মিকতার কবচ পরে, যেদিন নতুন করে শেখাতে হবে না তাদের আধ্যাত্মিকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার পিছনে বিবেকানন্দের এইসবই ছিল চিন্তাভাবনা। কিন্তু তিনি জানতেন, শুধু মহৎ পরিকল্পনা করলেই হয় না, তাকে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন অর্থের। সে অর্থ ভারতের ধনিক সম্প্রদায় তাঁকে দেবেন না, অথবা দিতে পারবেন না। তাই ভাবনায় পড়লেন স্বামীজী। এমনই সময় ১৮৯৩ সালে শুনলেন, চিকাগোতে হচ্ছে বিশ্বধর্ম সম্মেলন। স্বামীজী ভাবলেন, এই সুযোগ। একেই কাজে লাগাতে হবে। ওই সম্মেলনে শোনাতে হবে ধর্মের শাশ্বত কথা, শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাধারার কথা আর ওইসঙ্গে ওই সম্মেলনই তাঁর স্বপ্নের মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের সুযোগ এনে দেবে। গেলেন তিনি চিকাগোতে। স্বীকৃতি পেলেন শ্রেষ্ঠ বক্তার। অর্থ সংস্থানে তেমন সফল না হলেও নিউইয়র্ক আর লণ্ডনে বেদান্ত চর্চার দু'টি কেন্দ্র স্থাপনেও নিলেন ব্যবস্থা।

১৮৯৭ সালে স্বামীজী ফিরে এলেন ভারতে। পেলেন বীরের সম্বর্ধনা। প্রস্তুত হ'ল ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্র। ওদিকে ১৮৯১ সালের নভেম্বরে বরানগর থেকে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছে আলমবাজারে একটি ভাড়া বাড়িতে। ১৮৯৭ সালের পয়লা মে স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের এক সভা ডাকলেন, সেইখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হ'ল রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন। গুরু-ভাইদের ইচ্ছায় বিবেকানন্দ হলেন মিশনের সাধারণ সভাপতি আর স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ হলেন যথাক্রমে সহ সভাপতি ও কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনুধ্যান এবং কিছু ত্রাণকাজ চালানোই হ'ল ওই সংস্থার তখনকার মূল উদ্দেশ্য। ১৮৯৮ সালে গঙ্গার পশ্চিমতীরে হাওড়ার বেলুড়ে একতলা বাড়ি সমেত কিছুটা জমি সংগ্রহ করা হ'ল। মূলতঃ, স্বামীজীর ভক্ত মিসেস ওলি বুল এবং মিসেস হেনিরিয়েটা মুলারের দেওয়া টাকাতেই এই জমি কেনা ও নতুন বাড়ি তৈরি হয়। ১৯০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন পঞ্জীভুক্ত

হ'ল রামকৃষ্ণ মিশন নামে দাতব্য সংস্থা হিসেবে। এই মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলরাম বসুর বাড়ির সভায় যে প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং পরে যা ছাপিয়ে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয় তা থেকে জানা যায়, মানুষের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর কাজে, জীবনে যা প্রতিপাদিত হয়েছে, তার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পরমার্থিক উন্নতিকল্পে যাতে সেইসব তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে, সেই বিষয়ে সাহায্য করা এই মিশনের উদ্দেশ্য। এই বেলুড়ই হ'ল রামকৃষ্ণ মঠের স্থায়ী আবাস। কালে বেলুড়ই হয় রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সদর দপ্তর। ১৮৯৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বেলুড় মঠের পাশের নীলাম্বর মুখার্জি বাগানবাড়িতে উঠে আসে আলমবাজার মঠ। বেলুড় মঠের কাজ ভালভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্যই নেওয়া হয় এই ব্যবস্থা। পুরনো বাড়ির সংস্কার, নতুন দোতালা বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হল ১৮৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর আর ১৮৯৯ সালের ২ জানুয়ারি থেকেই সন্ন্যাসীরা বাস করতে থাকেন এই মঠে।

জীবে দয়া নয়, জীব সেবার যে আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন স্বামীজী আজীবন তার প্রকাশ ঘটে এই মঠ তৈরির সময়ও। জমি সমান এবং বাড়ি তৈরির কাজে লেগেছিল যে সাঁওতাল এবং অন্যান্য শ্রমিক তাদের একদিন ভালভাবে খাওয়ানোর আয়োজন করলেন স্বামীজী। শ্রমিকরা বহু জায়গায় কাজ করেছে—কিন্তু এ তাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কেউ কোনদিন তাদের এত আদর করে খাওয়ায়নি। তাদের সেই পরিতৃপ্ত রূপ দেখে স্বামীজী বলেন, "এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ-এমন সরল চিত্ত—এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি। ...এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস।"

বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজ শুরু হবার আগে থেকেই চলে মঠ-মিশনের নানা শাখার কাজ। বেদান্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচারের জন্য ১৮৯৫ এবং ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 'ব্রহ্মবাদিন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা দু'টি। স্বামীজী তখনও রয়েছেন আমেরিকায়। প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক রাজম আইয়ারের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি উঠে যাবার উপক্রম হয়। ওই সময় এর হাল ধরেন লণ্ডন থেকে স্বামীজীর সঙ্গে আসা ক্যাপ্টেন সেভিয়ের এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁরা তখন আলমোড়াবাসী, স্বামীজীর কথায় তাঁরা দায়িত্ব নিলেন পত্রিকাটির। ১৮৯৮ সালের আগষ্টে আলমোড়া থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হ'ল। কিছুদিন পরে ক্যাপ্টেন সেভিয়ের মায়াবতীতে এক জমিদারি কিনে ১৮৯৯ সালের ১৯ মার্চ সেখানে প্রতিষ্ঠা

করলেন অদ্বৈত আশ্রমের। স্বামী স্বরূপানন্দকে সম্পাদক করে এখান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে 'প্রবুদ্ধ ভারত।' স্বামীজীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা এবং আর্থিক সাহায্যে ১৮৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে বাংলা পত্রিকা 'উদ্বোধন'।

মঠ ও মিশনের থেকে সমাজ সেবার কাজে প্রথম এগিয়ে আসেন স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ। এ সম্পর্কে স্বামীজীর স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য তিনি স্বামীজীর কাছে জানতে চাইলে আমেরিকা থেকে স্বামীজী লেখেন, "দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরক্ষর, পতিত মানুষের মধ্যে রয়েছে তোমার ভগবান, জেনো এদের সেবা করাটাই সবচেয়ে বড় ধর্ম।" পথ পেলেন অখণ্ডানন্দ। রাজস্থানে সমাজের ওইসব অবহেলিতের জন্য স্থাপন করলেন বিদ্যায়তন। ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের রূপ দেখে স্বামী অখণ্ডানন্দ আলমবাজারে খবর পাঠান। বিবেকানন্দ দুর্ভিক্ষের খবর শুনেই মুর্শিদাবাদে কিছু টাকা দিয়ে পাঠালেন দু'জন কর্মীকে। মিশনের প্রথম ত্রাণ কাজ শুরু হ'ল মাহুলায় ১৮৯৭ সালের ১৫ মে থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দের পরিচালনায়। দুর্ভিক্ষে অনাথ কয়েকটি শিশুর ভার এসে পড়ে অখণ্ডানন্দের ওপর। তাদের নিয়ে তিনি সরগাছিতে তৈরি করলেন এক আশ্রম। প্রতিষ্ঠিত হ'ল মিশনের প্রথম শাখাকেন্দ্র। ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর নির্দেশে মাদ্রাজে গিয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম শাখা-মঠ।

এদিকে মঠে আরো কিছু যুবক যোগ দিলেন। স্বামীজীর প্রথম ভারত ত্যাগের আগেই তাঁর কাছে সন্ন্যাস নেন স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী) এবং স্বামী সদানন্দ (শরৎচন্দ্র গুপ্ত)। দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাবার আগে স্বামীজী আরো ৯ জন নবাগতকে দেন সন্ন্যাস। স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিলেও ১৮৯৮ সালে সন্ন্যাস নেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাছ থেকে।

১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি কুমারী মার্গারেট নোবেল স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করার জন্য এলেন, ব্রহ্মচর্য নিয়ে হলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজীর নির্দেশে ওই বছরের ১৪ নবেম্বর উত্তর কলকাতায় একটা ছোট ভাড়া বাড়িতে তিনি শুরু করলেন মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয়। সে বিদ্যালয়ই আজকের নিবেদিতা স্কুল। প্রায় এই সময়ই কলকাতায় দেখা দিল মহামারী প্লেগ। নিবেদিতা এবং স্বামী সদানন্দ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেবা কাজে।

বেদান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বামীজী লণ্ডন এবং নিউইয়র্ক গেলেন ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাকে

নিয়ে। লণ্ডনে এর আগে থেকেই বেদান্ত প্রচার করেছেন স্বামী অভেদানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েসনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হবার জন্য ওই সময় স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। স্থাপিত হয় আমেরিকায় আরো কয়েকটি আশ্রম। ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে স্বামীজী ফিরে আসেন ভারতে।

বারাণসীতে বিবেকানন্দের কয়েকজন অনুগামী একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। ফলে রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিস নামে এটি রামকৃষ্ণ মিশনের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বামীজীর নির্দেশে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামী শিবানন্দ বারাণসীতে শুরু করেন রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের কাজ। দুর্ভাগ্যক্রমে ওইদিনই স্বামী বিবেকানন্দ ইহলীলা সম্বরণ করেন।

১৯০১ সালের ৬ নবেম্বর এক ট্রাস্ট দলিল করে স্বামীজী তাঁর ১১ জন সন্ন্যাসী গুরুভাইকে রামকৃষ্ণ মঠ বা বেলুড় মঠের অছি করেন। অছিরা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মিশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করেন। আলমবাজার মঠের জন্য স্বামীজী যেসব বিধি প্রণয়ন করেন সেগুলিকে বেলুড়ে আরো বিস্তৃত করা হয় এবং যখন মঠের শাখা প্রশাখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সব কাজের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ১৯৩৫ সালে প্রণয়ন করা হয় রুলস এণ্ড রেগুলেসনস অব দি রামকৃষ্ণ অর্ডার ১৯৩৫। একই ভাবে আইনগত দিক খতিয়ে দেখে এগুলি সংশোধিত ভাবে পরিচিত হয় রুলস এণ্ড রেগুলেসনস অব রামকৃষ্ণ মঠ অব ১৯৩৭। কয়েকটি সংশোধন ছাড়া সেগুলিই আজও বলবৎ রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন পঞ্জীভুক্ত হয় ১৯০৯ সালে। সেইসময় যে বিধি প্রণয়ন করা হয় তা বিস্তৃত করা হয় ১৯৭০ সালের নবেম্বরে।

স্বামী বিবেকানন্দের ট্রাস্ট দলিল অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মঠ আধ্যাত্মিক কাজকর্ম, শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা এবং মঠ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে এবং মিশনের কাজ হচ্ছে শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য দাতব্য কাজকর্ম এবং বেদান্তের আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসৃত অন্য বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রসারমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করা। মঠের অছিরা মিশনের গভর্নিং বডি গঠন করেন এবং যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্বাসী তাঁরাই এর সদস্য হতে পারেন। প্রথমে লক্ষ্য যাই থাক, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই প্রতিষ্ঠান একে অন্যের কাজ করতে থাকে। আজ আইনের দিক থেকে দু'টি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হলেও কাজের দিক থেকে অভিন্ন।

প্রথম থেকেই স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল মেয়েদের জন্য আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান করা। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয় ১৯৫৪ সালে। মা সারদা দেবীর জন্মশতবর্ষে স্থাপিত হয় সারদা মঠ। স্থাপিত হয় মিশনের শাখা রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, এদের

হাতে তুলে দেওয়া হয় মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রকে এবং সেগুলি এখন শুধু মহিলাদের জন্যই পরিচালিত হচ্ছে।

স্বপ্নসম্ভবা রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন আজ আর শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বের ধর্মজগতের একটি নাম, একটি ইতিহাস—একটি প্রতিষ্ঠান।

১৮৮৬ সালে বরানগরের ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে উপ্ত হয়েছিল যে প্রতিষ্ঠানের বীজ ১৯৭৮-৭৯ সালের হিসেবে দেখা যায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে তার ৭৫টি কেন্দ্র। ওইসব কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা হয় নার্সারি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৫৯টি স্কুল ও কলেজ। পরিচালনা করা হয় আটটি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল এবং ৬০টি বহির্বিভাগের ডিসপেনসারি। এছাড়া বহু মন্দির, গ্রন্থাগার এবং প্রকাশনা কেন্দ্রও পরিচালনা করছে এই দুই সংস্থা। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে মিশন আজ সরকারি সংস্থার চেয়েও তৎপর। ভারত জুড়ে গ্রাম ও উপজাতি এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে মঠ ও মিশনের উন্নয়ন কাজ। প্রতি কেন্দ্র থেকেই নেওয়া হয় নানা ধর্মীয় উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ।

ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস ও ফিজিতে মিশনের কেন্দ্র কাজ করে চলেছে একই ধারায়। প্যারিসের কাছে গ্রেৎজ-এ যে কেন্দ্র রয়েছে তা করে ধর্মপ্রচার। রামকৃষ্ণ মঠের ধর্মপ্রচার কেন্দ্র রয়েছে জেনিভায়, লণ্ডনের কাছে বোর্ণ এণ্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক, বোস্টন, প্রভিডেন্ট, চিকাগো, সেন্টলুইস, সানফ্রানসিসকো, হলিউড, বার্কলে, পোর্টল্যাণ্ড, সীটল, সাক্রামেন্টো এবং সান্টা বারবারায় রয়েছে ১২টি কেন্দ্র। সান ফ্রানসিসকো এবং হলিউডের কেন্দ্র দু'টি পরিচালনা করে বেশ কয়েকটি কনভেন্ট। প্রতিটি কেন্দ্রেরই রয়েছে আবার বেশ কিছু শাখাকেন্দ্র।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরিচালনায় এইসব কেন্দ্র আজও কাজ করে চলেছে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত গড়ার ব্রত উদযাপনের জন্য। যে ভারতে মানুষে মানুষে থাকবে না ভেদ, জাতপাতের ছুৎমার্গ ভুলে যে ভারতে মানুষ থাকবে সুখে-শান্তিতে, যে ভারত আধ্যাত্মিক চেতনায় বলীয়ান হয়ে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে দেখাবে শান্তির পথ। সেই ব্রত সফল হবার দিনটির দিকে আমরা তাকিয়ে আছি প্রত্যাশা নিয়ে, প্রত্যয় নিয়ে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

বাখাল আমার ব্রজের বাখাল, গোপাল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে এ উক্তি স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। শুধুই কি গোপাল? তিনি ছিলেন ঠাকুরেব মানসপুত্র। ঠাকুরেব কথাতেই, "রাখাল আসিবার পূর্বে দেখিতেছি মা (জগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, এটি তোমার পুত্র। ইহা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম, সে কি? আমার আবার ছেলে কি? তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সাধারণ সংসারী ভাবের ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত্র। তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম, এই সেই বালক।"

ব্রহ্মানন্দ বা রাখাল মহারাজ সম্পর্কে ঠাকুরের বলার যেন শেষ নেই। বলেছেন, "রাখাল প্রভৃতি এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বর-কোটি—এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।"

অন্য এক সময় ঠাকুর বলেছেন, "এক প্রকার আম আছে যা পাকলে বাইরে থেকে বোঝা যায়না। রাখাল সেই আমের মত।"

ঠাকুরের এই ব্রজের রাখালকে স্বামী বিবেকানন্দ নাম দিয়েছিলেন রাজা—মহারাজা। সে নাম শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, হ্যাঁ, এ আমার রাখালের উপযুক্ত নামই হয়েছে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপূর্ব কর্মশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তায় অটল বিশ্বাসী বিবেকানন্দ বলতেন, অপরে আমায় ত্যাগ করতে পারে কিন্তু রাজা শেষ পর্যন্ত আমায় ছেড়ে যাবে না।

স্বামীজীর এ প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠিকভাবে সঠিক পথে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে পরিচালনা করে গেছেন যিনি, তাঁর নাম স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

কর্মশক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়ে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্থানীয় ভক্তদের বলেছিলেন, তোমরা ঠাকুরকে কেউ দেখনি, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখলেই ঠাকুরকে দেখা হয়।

কথাটা সত্যি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন চলতেন তখন পেছন থেকে মনে হত যেন স্বয়ং ঠাকুর চলেছেন, তাঁর ছায়াকে মনে হ'ত ঠাকুরেরই ছায়া।

তাই রামকৃষ্ণানন্দ ভক্তদের বলতেন, এই ফুল ও ফল ব্রহ্মানন্দজীকে নিবেদন কর। তাঁকে নিবেদন করা আর ঠাকুরকে নিবেদন করা একই কথা।

অধ্যাত্মলোকে ব্রহ্মানন্দের এই উত্তরণের স্বীকৃতি রয়েছে বিবেকানন্দের কথাতেও। তিনি বলেছেন, রাজা আমার চেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনেক বলীয়ান।

অথচ তাঁর মধ্যে ছিল এক অপূর্ব বালক স্বভাব। সেই স্বভাবই শ্রীরামকৃষ্ণকে করেছিল বাৎসল্য রসে উজ্জীবিত। সেই স্বভাবের বলেই তিনি রামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যে চিহ্নিত হয়েছিলেন এক স্বতন্ত্র পুরুষ রূপে। তার চেয়ে বয়সে বড় বাবুরাম বা স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র রাখালই ছিলেন বালক-ভাবাপন্ন। তাই তাঁকে নিয়ে মাতৃভাবে ভাবিত ঠাকুর বাৎসল্যরস সম্ভোগ করতেন।

তাঁর সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রথম সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ এক তরুণ কর্মীকে বলেছিলেন, যখন আমি কিছু বলি তখন তুমি বিচার করে দেখবে আমি ঠিক না ভুল বলছি। কিন্তু রাজা মহারাজ যা বলেন তুমি নিঃসন্দেহে বিনা বিচারে তা সত্য বলে গ্রহণ করবে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষও স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে বলেছেন প্রায় একই ধরনের কথা। কেন তিনি ব্রহ্মানন্দকে শ্রদ্ধা করেন, ভক্তি করেন তা বিশ্লেষণ করে বলেছেন "বয়সে আমার তুলনায় রাখাল বালক মাত্র। আমি জানি ঠাকুর তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। কিন্তু সেই কারণেই যে আমি তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করি তাহা নহে। একবার আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হই। তখন ঠাকুরের প্রতি আমার সকল বিশ্বাস তিরোহিত হয়, আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। গুরুভ্রাতৃ-গণের অনেকে আমায় দেখিতে আসিলেন। আমার মানসিক দুরবস্থার কথা তাঁহাদিগকে জানাইলাম, কিন্তু তাঁহারা নীরব রহিলেন। একদিন রাখাল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন? উত্তরে আমি আমার হৃদয়ের শুষ্কতা ও

অবিশ্বাসের কথা জানাইলাম। মনোযোগের সহিত শ্রবণান্তে তিনি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ উত্থিত হয়, আবার নামিয়া যায়; আবার উঠে। মনও তদ্রূপ। আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনার বর্তমান নীরস ভাবটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিকাশের পূর্বাভাস।

রাখাল চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের শুষ্কতা অন্তর্হিত হইল এবং পূর্ব বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল এবং আমার মন উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিল।"

এই হ'ল রাখাল বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বিবেকানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ—বয়সে মাত্র ৯ দিনের ছোট বড়। কলকাতার ট্রেনিং আকাদেমিতে একই স্কুলে পড়তেন তাঁরা। একইসঙ্গে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মনেতা কেশব সেনের বক্তৃতায়, একই সঙ্গে শুরু করেছিলেন সমাজে যাতায়াত, এমনকি একই সময়ে স্বাক্ষর করেছিলেন সমাজের খাতায়, শপথ নিয়েছিলেন—তাঁরা করে যাবেন নিরাকারের সাধনা।

তারপরই সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। ১৮৮১ সালের প্রায় মাঝামাঝি। রাখালের তখন সবে বিয়ে হয়েছে। এমনি একটা সময়ে শালা মনোমোহন মিত্র নৌকো করে তাঁকে নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বললেন, এর অসাধারণ শুভ সংস্কার আছে। তারপরই জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি গো?

আমার নাম রাখাল।

রাখাল। আহা-হা—রাখাল আমার ব্রজের রাখাল—আমার গোপাল। কথাগুলি বলতে বলতেই ঠাকুর হলেন ভাবাবিষ্ট, তারপর বললেন, আবার এসো, কেমন?

এই ১৮৮১ সালেরই নবেম্বর মাস। ভক্ত সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন বিবেকানন্দ বা নরেন্দ্রনাথ দত্তকে। দেখেই বুঝলেন, নরেন হ'ল খাপ খোলা তরোয়াল। তাঁকেও বললেন, আবার এসো।

রাখাল এবং নরেন দুজনেই আবার এলেন দক্ষিণেশ্বরে। শুধু একবার নয়, বারবার, চিরতরে। কিন্তু নরেন এসেছিলেন একটা চ্যালেঞ্জের ভাব নিয়ে আর রাখালের ভাব ছিল অন্য। সে যেন আসে তার মা'র কাছে। রাখালের তখনকার সেই ভাব দেখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তখন রাখালের এমন ভাব ছিল ঠিক যেন তিন চার বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মা'র মত দেখত। থেকে থেকে সহসা দৌড়ে এসে আমার কোলে বসে পড়ত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তন্যপান করত। বাড়ি তো দূরের কথা, এখান থেকে এক পা নড়তেও চাইত না। তার বাপ পাছে এখানে না আসতে দেয় তার জন্য কত বুঝিয়ে এক একবার

বাড়িতে পাঠাতাম। তার বাবা ছিল জমিদার কিন্তু কৃপণ। সে প্রথম প্রথম নানা চেষ্টা করছিল ছেলেকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার। কিন্তু পরে যখন দেখল এখানে সব বড় বড় বিদ্বান মানী-লোক আসে এবং ছেলেকে বাড়ি পাঠাতেও যখন বাধা দেওয়া হয়না তখন সে আর আপত্তি করেনি।

বিবেকানন্দ কিন্তু এসেছিলেন উদ্যত ফণা-ফণীর মত একটা চ্যালেঞ্জের ভাব নিয়ে। ঠাকুরকে তাঁর সরাসরি প্রশ্ন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? তাছাড়া বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে নিরাকার সাধনার যে শপথ নিয়েছিলেন তা থেকে তখনও এতটুকু বিচ্যুত হননি। তাই তাঁর মনে ছিল সংশয়, ছিল দ্বন্দ্ব।

সেই সংশয়, সেই দ্বন্দ্বের বশে তিনি রাখালের সঙ্গেও মেতেছিলেন কথা কাটাকাটিতে।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে বসেছেন নরেন আর রাখাল। ঠাকুরের ঘরে তখন রয়েছেন মাত্র দু'জন। সেইসময় নরেন যেন কিছুটা উত্তাপেই ফেটে পড়লেন। বললেন, রাখাল, তুই ভণ্ড, তুই কপটাচারী।

একথা বলছ কেন নরেন?

তুই আমার সঙ্গে সমাজে যাওয়া-আসা করিস, সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে তুই না সই করেছিস?

কিন্তু কপটাচরণটা দেখলে কোথায়? এখানে আসি বলে? সেতো তুমিও আস।

আমি আসি ঠিক, কিন্তু নিরাকারের পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হইনি। আর তুই কিনা সাকারে মজে গেলি।

তক্তপোষের ওপর চোখ বুজে ঠাকুর শুনছিলেন দুই বন্ধুর বাগ্‌যুদ্ধ। শুনতে শুনতে এক অপূর্ব ভাবরসে হচ্ছিলেন তিনি আপ্লুত। একদিকে সপ্তর্ষির এক ঋষি নবরূপী নারায়ণ অন্যদিকে ব্রজের রাখাল। দুইয়ের দ্বন্দ্ব তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে করতে থাকে রোমাঞ্চিত। শেষে আর শুয়ে থাকতে পারলেন না তিনি। উঠে বসলেন। সারা মুখে তখন তার দিব্যানন্দের প্রকাশ। অর্দ্ধস্ফুট অবস্থায় তিনি নরেন্দ্রনাথকে বললেন, "রাখালের সাকারের ঘর, তোর নিরাকারের। রাখালকে আর কিছু বলিসনি। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে। সকলেই কি একবারে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে?"

সাকারের থাকের লোক ব্রহ্মানন্দ আপন সাধনার শেষে তাই বলেছিলেন, 'খুব জপ কর বাবা, খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। জপ করতে

রতেই মন স্থির হয়ে ইষ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তি চিন্তা রতে হয়। তাতে জপ ধ্যান দুই-ই একসঙ্গে হয়ে যাবে।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, জান্তে অজান্তে বা ভ্রান্তে—যে কোন ভাবেই হোক কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে। কেউ তেল মেখে নাইতে যায় তারও মন স্নান হয়—আর যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় তারও তেমনি ন হয়। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের জ হয়ে যায়।

ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট মহারাজ মী ব্রহ্মানন্দও একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, প্রত্যহ কিছু কিছু ধ্যান জপ রবে। কোন দিন বাদ দেবে না। মনকে বারবার টেনে এনে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন রবে। এই রকম দু'তিন বছর করলেই দেখবে যে প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ সছে, মনও স্থির হচ্ছে। প্রথম প্রথম জপ ধ্যান নীরসই লাগে, কিন্তু ওষুধ খাবার ত জোর করে মনকে ইষ্টের চিন্তায় নিযুক্ত রাখতে হয়, তবে ক্রমে আনন্দ সে। হেলায় হোক, আর খুব ভক্তিতেই হোক নাম করলে তার ফল হবেই। ক্তি বিশ্বাস এর একটা থাকলেই ভগবান লাভ হয়। সময় না হলে হাঁকপাকা ল নিতে নেই।

জীবনচর্যায় তিনি ছিলেন সহজ সরল মানুষ। তাঁর কথাবার্তাতেও ঘটত তারই কাশ। একদিন এক ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, মহারাজ সংসারে কি রকম বে থাকতে হয়? নিষ্কাম ভাবে থাকাই তো উচিত?

উত্তরে একটু হেসে মহারাজ বলেছিলেন কি জান, নিষ্কাম টিষ্কামও খুব উঁচু কথা। সংসারে থেকে ওসব হয় না। াস্তবিক খতিয়ে দেখা যায় যে, কোন না কোন কামনার তাড়নায় কাজ করছি। তাহলেই হ'ল যে, নিষ্কাম কর্ম হয় না। তবে সংসারের কাজ করতে করতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, প্রভু আমার কাজ কমিয়ে দাও।

সাধন পথের পথিক হয়েও কর্মযজ্ঞ থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোন দিন পিছিয়ে থাকেননি। বরং কর্মের মধ্যে দিয়েই ঘটেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ, ওরই মধ্যে দিয়েই এসেছে সাধনার চরম সিদ্ধি। তাই কর্মহীনতার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, আর তা ছিলেন না বলেই কেউ যদি ওই পথে মুক্তি পাবার উপায় তাঁর কাছে জানতে আসতো তিনি তাদের তাঁর স্বভাব সুলভ ভাষায়

বরং একটু ধমকেই দিতেন। বলতেন, আমরা কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো? না, তা নয়। তার কাছে সরল প্রাণে প্রার্থনা করতে হবে, হে প্রভু! আমি ভাল-মন্দ কিছুই জানি না, আমি তোমার আশ্রিত, আমার যা অভাব—তুমি তা পূরণ কর, যে রাস্তায় চললে আমার কল্যাণ হবে সে রাস্তায় নিয়ে চল, তোমায় স্মরণ মনন করার শক্তি দাও। তাঁর আশীর্বাদ, কৃপা কি কিছু কম আছে? মানুষ মাথা পেতে নেবে না, চোখে চেয়েও দেখবে না। বড় বড় কথা বলা ও বাজে বকাই মানুষের স্বভাব। এই করেই জীবন কাটায়। ফলও তেমনি পায়। প্রত্যহ মনকে খোঁচাতে হবে, কি করতে এসেছি, কি করে দিনটা গেল? বাস্তবিকই কি ভগবানকে আমার চাই? চাই যদি তো পাচ্ছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি চাওয়ার মত কাজ করছি কিনা? সদাই তাঁর স্মরণ মনন করবে। স্মরণ মনন সর্বক্ষণ অভ্যাস হলে তখন ধ্যান করতে পারলেই জমে যায়।

তিনি বলতেন, নিষ্ঠা একটা মস্ত জিনিস। নিষ্ঠা না থাকলে কোন কাজে কৃতকার্য হওয়া যায় না। নিষ্ঠা এমন চাই যে, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমাকে আমার নিয়ম পালন করতেই হবে। কর্ম ও উপাসনা এক সঙ্গেই করতে হবে। আমরাও তো ৫।৬ বছর ঘুরে ঘুরে তারপর কাজে লাগি। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) আমাকে ডেকে বল্লেন, ওরে ওতে কিছু নেই কাজ কর। আমরাও তখন সবরকম কাজ করেছি। মনে রাখবে আড্ডার মত শত্রু নেই। ওতে একবারে অধঃপতন এনে দেয়। সাধন ভজনের পক্ষে এটা বড় বিঘ্নকর। মনকে বড় বিক্ষিপ্ত করে দেয়। ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়। সাধন ভজন করতে গেলে খাওয়া কমিয়ে দিতে হয়। এক পেট খেয়ে ধ্যান জপ হয় না। হজম করতেই সব শক্তি বেরিয়ে যায়।

এসব শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৯ সেই সময়ই তিনি ধর্ম চিন্তায় বিভোর হয়েছিলেন। যদিও তার আগে থেকেই তাঁর মধ্যে হয়েছিল ধর্ম চেতনার বিকাশ। সুদীর্ঘ ১৫ বছর সাধনা করে তিনি করায়ত্ত করেছিলেন সিদ্ধি এবং ঋদ্ধিকে। তারপর ২৫ বছর তিনি পরিচালনা করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে। সেই সময় তাঁকে মনে হয়েছে অপূর্ব দক্ষ এক প্রশাসক। অথচ তাঁরও মধ্যে ব্যাহত হয়নি তাঁর সাধনা। বিরত থাকেননি তাঁর নিত্যকর্ম থেকে।

তখন ব্রহ্মানন্দ রয়েছেন বৃন্দাবনে। সঙ্গে ছিলেন স্বামী সুবোধানন্দ। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভিক্ষাদি করে রক্ষা করতেন ব্রহ্মানন্দের জীবন। কেননা সে সময় তিনি

সারাক্ষণ বিভোর থাকতেন ধ্যানে। ধ্যানমগ্ন এই সাধকের সঙ্গে স্বামী সুবোধানন্দের কথাবার্তাই হ'ত না।

বৃন্দাবনে যখন চলছে ব্রহ্মানন্দের ধ্যান পর্ব। তখন সেখানে ছিলেন সাধক য়কৃষ্ণ গোস্বামীও।

বিজয়কৃষ্ণ আগে থেকেই ব্রহ্মানন্দকে জানতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে য়কৃষ্ণের ছিল প্রায় নিত্য যাতায়াত। তিনি জানতেন ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর কত করতেন। তাই ব্রহ্মানন্দের কঠোর তপস্যায় বিস্মিত বিজয়কৃষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেন ,ক, আপনার এত সাধনার দরকার কি? আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষ যা চায়, ঠাকুর আপনাকে অযাচিতভাবে তার সবই দিয়েছেন।

কথাটা শুনে একটু হেসে উত্তর দিলেন, যে আধ্যাত্মিক সম্পদ আমি তাঁর কাছ থেকে য়েছি তা আমি নিজস্ব করে নিতে চাই।

এই হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। কোন ফাঁকি নয়, যা পেয়েছেন তাতেই আত্মতুষ্ট য় নয়, যা পাওয়া গেছে সহজে, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে আরো কঠিন এই সত্যে নি ছিলেন বিশ্বাসী। তাই যেমন বিচ্যুত হননি কখনও সাধন পথ থেকে, কাউকে থে অবহেলা করতে দেখলেও তেমনি তিনি উঠতেন গর্জে। যখন যে আশ্রমে যেতেন ানেই তিনি সাধুদের বলতেন, ধিক্ তোমাদের, যদি তোমরা সংসার ছেড়ে বাবা মা ত্মীয়স্বজনের ভালবাসা ফেলে ঈশ্বর দর্শনের জন্য পুরোপুরি মন দিতে না পার, তবে

ভগবান লাভই সাধুজীবনের একমাত্র লক্ষ্য—সাধক মনে এই ভাবটি দৃঢ় করতে তিনি তেন, চেষ্টা করে মনে একটা অতৃপ্তি জাগাও। আত্মজিজ্ঞাসা কর, মনের কতটুকু রচিন্তায় দিয়েছো। রাতে শোবার আগে স্মরণ করে দেখো, সারাদিনের কত সময় ধ্যানে ও শাস্ত্রপাঠে কাটিয়েছো এবং কত সময় তোমার অন্য কাজে গেছে। যে য় অন্য কাজে দিয়েছো সেটা যে বৃথাই গেছে এটা জেনো।

সাধনজীবনের প্রতি এত কঠোর হয়েও ব্রহ্মানন্দ কিন্তু কখনই প্রশ্রয় দেননি হীনতাকে। পরবর্তীকালে তিনি যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন, তখন র অদ্ভুত কর্মক্ষমতা দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়। নিজের সাধন তপস্যার জন্য সময় টুকু না কমিয়ে তিনি মঠ ও মিশনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে কাজ র গেছেন, অন্যকে উদ্দীপিত করেছেন। তিনি বলতেন, নিষ্কাম কর্ম বা নিস্বার্থ ধনা নবযুগের সাধনা। তাই একদিন যখন এক নবীন সন্ন্যাসী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন,

মহারাজ। সংঘের কাজ কি শাস্ত্রোক্ত সাধনের বিরোধী নয়? তখন তিনি নি
উত্তেজনাকে দমন করতে পারেননি। দৃঢ় কণ্ঠেই সেদিন ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন, স্বামী
প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না। তিনি সংঘের জন্য, দেশের জন্য প্রাণপাত করেছে
নরনারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ কর। তোমরা সাধু, পরার্থে তোমাদের জীব
সাধনের পথে মনোগত বাসনাগুলিই প্রধান বিঘ্ন, কাজের চাপ নয়। ঠাকুরের কাজে
হয় এই জীবনটা গেল। শত শত জীবন কি স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যয় করনি? নিস্বার্থ
ঠাকুরের কাজ করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে। তখন অল্লায়াসে মন ঈশ্বরের চি
ডুবে যাবে।

শুধু কথা নয়, আন্তরিকভাবেই তিনি বিশ্বাস করতেন এই সত্যে। তাই
পরিচালনার সময় কখনও কোথাও কর্মীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তিনি সেখা
গিয়ে বিরোধ মীমাংসার দিকে নজর দিতেন না, সে ব্যাপারে কাউকে কোন
জিজ্ঞেসও করতেন না। বরং তিনি সবাইকে নিয়ে বসে নানা আধ্যাত্মিক আলো
করতেন। কর্মীদের মনকে নিয়ে যেতেন বৈরাগ্য সাধনের পথে। উৎসাহিত করে
তাঁদের সাধন ভজনে। সবাই যখন আন্তরিক এবং গভীরভাবে মনকে নিয়ে যে
সাধনের পথে তখনই দেখা যেত, সেই সাধন স্রোতে কোথায় যেন ভেসে গেছে
বিরোধ, সব দ্বন্দ্ব, সব মতভেদ। জীবনের সনাতন সমস্যা সমাধানের দিকে নজর
ঐহিক সমস্যার যে অনায়াসে মীমাংসা হয় সেই কথাটি বারে বারে এমনি ভাবে
প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন।

ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এক বিচিত্র জীবনের অধিকারী। সম্পদের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক
এক চিরবৈরাগী মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। ঐহিক কোন কিছুতেই ছিল না
আসক্তি—বরং আসক্তিই দাসত্ব মেনে নিয়েছিল তাঁর কাছে। আর তাই সন্ন্যা
হয়েও তিনি রাজা—মহারাজ।

জন্ম তাঁর বিবেকানন্দের জন্মের ঠিক ন'দিন পরে। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়া
বিবেকানন্দের আবির্ভাব সিমুলিয়া অঞ্চলের দত্ত বাড়িতে আর ওই ১৮৬৩ সালের
জানুয়ারি বসিরহাটের শিকরা-কুলীন গ্রামে বিখ্যাত ঘোষ বাড়িতে ব্রহ্মানন্দের আবির্ভা
বাবা আনন্দমোহন ঘোষ ছিলেন জমিদার। তাই প্রায় সোনার চামচ মুখে দিয়ে ব্রহ্মান
জন্ম। তাঁর কমনীয় আর মাধুর্যমণ্ডিত রূপ দেখে বাবা-মা নাম রেখেছিলেন
রাখালচন্দ্র। সুন্দর সেই শিশু কিন্তু ছিল সদা গম্ভীর। ভবিষ্যতে যিনি হবেন সন্ন্যা
সংঘের রাজা সংসারের প্রতি তাঁর মোহ না থাকারই কথা। আর একাজে ঈ

তার সহায়। তাই তাঁর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখনই ইহলোক ত্যাগ করলেন কৈলাসকামিনী। অসহায় শিশুকে মানুষ করার তাগিদেই আনন্দচন্দ্র করলেন দ্বিতীয় হ। বিমাতা হেমাঙ্গিনী ঘরে এসেই পরমস্নেহে কোলে টেনে নিলেন তাঁকে।

বয়স বাড়ে। গ্রামের পাঠশালায় শেষ হয় প্রাথমিক শিক্ষা। আনন্দমোহন ছেলেকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। তাই ছেলেকে নিয়ে এলেন কাতায়। কাঁসারিপাড়ার বাবাণসী ঘোষ স্ট্রীটে দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরবাড়িতে লেন ছেলেকে। রাখালচন্দ্র ভর্তি হলেন ট্রেনিং আকাদেমিতে। বয়স তখন তাঁর বারো। এই ট্রেনিং আকাদেমিতেই প'ড়তেন নরেন্দ্রনাথ। রাখালচন্দ্রের চেয়ে কিছু ক্লাসে। ভবিষ্যতে যাঁরা চলবেন একই পথে ক্লাসের বাধা তাঁদের কাছে মিলনের বাধা পারে না। তাছাড়া দুজনেই ছিলেন একই বয়সী তাই বন্ধুত্ব হল সহজেই। দুজনেই াছেন প্রাচুর্যের মধ্যে, অথচ মনে মনে দুজনই বৈরাগী। দুজনই খেলাধুলা ভাল-ান, কুস্তিও শেখেন একই আখড়ায়। মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের অম্বিকা গুহের কুস্তির াড়ায় ধুলো মাটি মেখে শরীরটাকে সবল করে তোলেন তারা। স্কুলে নরেন্দ্রনাথ ীক দিয়েই যেন আগলে রাখতেন রাখালচন্দ্রকে। তাঁর সব কাজই তখনই স্ত্রিত হতো নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছায়। তাঁরই প্রভাবে তাঁরা যোগ দিলেন ব্রাহ্মসমাজেও। ই মতো শরীর গঠন, সংযত আহারবিহার আর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করাটা ওঠে রাখালচন্দ্রের রোজকার জীবনের বাঁধা রুটিন। পড়াশোনাটা এসময় তাঁর কাছে া হয়ে ওঠে।

রাখালচন্দ্রের জীবনে নরেন্দ্রনাথের প্রভাব বিশ্লেষণ শেষে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, শুর ন্যায় সরল প্রকৃতিসম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেন্দ্রনাথের সপ্রেম ব্যবহারে হইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ইহা আশ্চর্যের া নহে।"

থাক সে বিশ্লেষণ। রাখালচন্দ্রের পড়াশোনায় অবহেলা আর বৈরাগী মনের চয় পেয়ে বাড়ির লোক চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন বিয়ে দিলে বোধহয় লর সংসারে মতি হবে। পাত্রীর জন্য বেশি খোঁজ করতে হ'ল না। কোন্নগরের কার ভুবনমোহন মিত্রের ছেলে মনোমোহন থাকেন সিমুলিয়ায়। সেই সূত্রেই তাঁর া বোন বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালের বিয়ে ঠিক হ'ল। কুলেশীলে ভাল ঘর, মেয়েটিও ক্ষণা তাই বিয়ে হতে দেরি হ'ল না। রাখালের বয়স তখন ১৮, আর বিশ্বেশ্বরীর ১১। বিয়ের পরও ছেলের মন কিন্তু ঘরমুখো হয় না। শ্যালক মনোমোহন আগে থেকেই

দক্ষিণেশ্বরে যেতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিল তাঁর সপ্রেম সম্পর্ক। তাই শ্যালকের মু তাঁর কথা শুনে তাঁকে দর্শনের জন্য রাখালের মন হ'ল উচাটন। বিয়ের তখনও একবছ পার হয়নি। রাখাল শ্যালকের সঙ্গে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলে এই সেই ছেলে যাঁকে দেখিয়েছেন মা জগদম্বা। আর রাখাল তাঁর সেই প্রথম দর্শনে অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'প্রথম দর্শনেই আমার অন্তরে বিদ্যুৎচমকের মং কি এক উচ্ছ্বাস খেলে গেল—আমার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এককালে তাঁর প্রতি আ হয়েছিল ঠিক চুম্বক যেমন লোহাকে টানে। মনে মনে ভাবলাম, ইনি কে? কে এ সৌম্য মহাপুরুষ? তাঁর প্রতি তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল- কী-যেন একটা দিব্যমাধু তাঁর পলকহীন দৃষ্টির সামনে খেলে বেড়াচ্ছে। ফিরে আসবার সময় সারাটা পথ আমা কানে বাজছিল তাঁর সেই মধুর কথা দু'টি—আবার, আবার এসো।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মিলন হয়েছিল আরো কয়েকমাস পরে বিবেকানন্দ এসে বলেছিলেন, আপনি ঈশ্বর দেখেছেন? আমাকে ঈশ্বর দেখা পারেন? রাখালচন্দ্রকে কিন্তু তা বলতে হয়নি। না বলতেই তিনি পেয়েছিলে ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা। কোন প্রস্তুতি ছাড়া মুহূর্তে তাঁর হয়েছিল ঈশ্বর দর্শন সেদিনের সেই মুহূর্তের আনন্দের স্বাদটি রাখালচন্দ্রের জীবনের চিরকালের পাথে হয়ে থাকে। তিনি নিজে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "তখন বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে থে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করি। একদিন দুপুরবেলা গেছি, মা কালীর মন্দির ক ঠাকুর খেয়ে বিশ্রাম করছেন। আমি যেতেই ওঁর বিছানায় বসালেন। একথা সেক পর বললেন, একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দেতো। আমি বললুম মশায়, এটি মাপ করবেন আমারই পায়ে কে হাত বুলিয়ে দেয় তার ঠিক নেই। বেশ তো গল্প করছিলে গল্প করুন। তথাপি সানুনয়ে তিনি বললেন, দে না, সাধু সেবার ফল আছে দু'তিন বার বলার পর পায়ে হাত দিতেই অবাক কাণ্ড! আমি তো তাজ্জব! লোক কি ভৌতিক জানে? সাদা চোখে দেখলাম, মা কালী সাত আট বছরের মে রূপে তীরবেগে ঘরে ঢুকলেন, ওঁর তক্তপোশের চারধারে কয়েকবার ঘুরপাক খেলে পায়ে মল বাজছে, শেষে ওঁর বুকে মিলিয়ে গেলেন। মুচকি হাসতে হাসতে তি বললেন, দেখলি হাতে হাতে সাধু সেবার ফল?"

ফল ফলল, কিন্তু বাড়িতে সবাই চিন্তিত হলেন। রাখালচন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে যাও যতই বাড়তে থাকে বাড়ির লোক ততই চিন্তিত হতে থাকে। বাবা আনন্দমোহন প্রথ বাধা দিলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা চিন্তা করে শেষে আর কোন বাধা দিতেন না। বা

এল না শ্বশুরবাড়ি থেকেও। বরং শাশুড়ি নিজেই একদিন মেয়েকে নিয়ে এলেন ঠাকুরের কাছে। বললেন, দেখুন তো, এ ওর স্বামীর সাধন পথের বাধা হবে কি না? ঠাকুরের সেদিনের উত্তর ছিল, না। তারপর তিনি তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন, নহবতখানায় আর সারদাদেবীকে বলে পাঠালেন, টাকা দিয়ে ছেলের বউয়ের মুখ দেখো।

এরই মধ্যে ঠাকুর একদিন রাখালকে দীক্ষা দিলেন। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট রাখালকে তিনি বললেন, এই নে তোর মন্ত্র, এই দ্যাখ তোর ইষ্ট। সেদিন রাখালচন্দ্রের হয়েছিল ইষ্টদর্শন।

রাখালের সেই সময়কার অবস্থাটা শোনা যাক ঠাকুরেরই মুখে। তিনি বলছেন, "আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যেই তাহাকে ঐরূপে দেখিত, সেই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীরননী খাওয়াইতাম, খেলনা দিতাম, কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি। ইহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সংকোচের ভাব আসিত না।

অন্যায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন কালীঘর হইতে প্রসাদী মাখন আসিলে সে ক্ষুধিত হইয়া আপনিই উহা লইয়া খাইয়াছিল। তাহাতে বলিয়াছিলাম তুই তো ভারি লোভা, এখানে আসিয়া কোথায় লোভ ত্যাগে যত্ন করিবি; না আপনি মাখন লইয়া খাইলি? সে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল, আর কখনও ঐরূপ করে নাই।

রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ, মা (জগদম্বা) যাহাদের এখানে আসিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে অকল্যাণ হয়।"

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরুর ৩ বছর পর রাখাল অসুস্থ হয়ে বলরামের সঙ্গে বৃন্দাবনে যায়। সেখানে পাছে তাঁর শরীরপাত হয় এই ভয়ে ঠাকুর সিদ্ধেশ্বরী কালীর কাছে চিনি মানৎ করেছিলেন। রাখালের প্রতি ঠাকুরের এত স্নেহ যে তার সামান্য বিচ্যুতিও ধরা পড়ত তাঁর কাছে। একদিন রাখাল তাঁর কাছে আসতেই তিনি বললেন, তোর মুখে কালিমা কেন রে? নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় করেছিস। রাখাল মনে করতে পারেন না।

পরে বলেন, ঠাট্টার ছলে একটা মিথ্যে তিনি বলেছেন। ভবিষ্যতে কোন ভাবেই মিথ্যে বলতে বারণ করে দেন ঠাকুর তাঁকে।

রাখাল ক্রমেই নিরাসক্ত হয়ে পড়েন সংসার সম্পর্কে। সাংসারিক সুখ দুঃখ তাঁর কাছে সমান। পুত্রের জন্ম সংবাদেও তিনি উল্লসিত হননি আবার সেই পুত্র এবং স্ত্রীর মৃত্যুও তাঁকে বিচলিত করেনি এতটুকু। কিন্তু ঠাকুর যখন অসুস্থ হয়ে কাশীপুর বাগান বাড়িতে ছিলেন সেই সময় আকুল হয়ে বলেছিলেন আপনার যাতে শরীর নাশ না হয় তাই বলুন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হলে রাখালও সেখানে এসে মিলিত হ'ল। বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিয়ে রাখাল হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। শুরু হ'ল তাঁর কঠোর সাধনজীবন। বরাহনগর থেকে তিনি যান পুরীতে। সেখানে কিছুদিন সাধনার পর আবার বরাহনগর এবং সেখান থেকে আবার তীর্থভ্রমণ। দেওঘর থেকে কাশী, সেখান থেকে নর্মদাতীরে ওঁকারনাথ। সেখান থেকে পঞ্চবটী, দ্বারকা, পোরবন্দর, গিরনার পাহাড়, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ ঘুরে আবার বৃন্দাবন। বৃন্দাবন থেকে আবারও নানা তীর্থ পর্যটন শেষে ফের স্থিতি সেই বৃন্দাবনেই। চলে সাধনা। কিন্তু "তাঁহার সাধনার ইতিহাস...সংগোপনে রাখিতেন অহমিকা প্রকাশের আশঙ্কায় তাহা কোন দিন প্রকাশ পাইতে দেন নাই। হিমালয়ের নিভৃত গুহায় তিনি দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, বৃন্দাবনে মাধুকরী করিয়া দিনান্তে একখানি মাত্র রুটি খাইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য কৃচ্ছ্র সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুকঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহাজ্ঞান লাভজনিত কোনরূপ অভিমান—কোনরূপ সাধ তাঁহার ছিল না। শত প্রযত্নে সে দিব্যজ্ঞানকে তিনি সংগোপন করিতেন।"

এদিকে যখন চলছে ব্রহ্মানন্দের সাধনভজন, ওদিকে তখন বরাহনগর মঠ স্থানান্তরিত হয়েছে আলমবাজারে। আমেরিকা থেকে বারবার আসছে স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি—সংঘবদ্ধ হও, এগিয়ে পড় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারে। চিঠি যায় বৃন্দাবনেও।

১৮৯৭ সাল। বিবেকানন্দ ফিরলেন স্বদেশে। তপস্যা থেকে ফিরলেন ব্রহ্মানন্দও। মিলন হ'ল আবার দু'জনের। এবার গড়ার পালা।

বিদেশ থেকে যে অর্থ স্বামীজী এনেছিলেন এবং এদেশে এসে তাঁর বিদেশী ভক্তরা যে অর্থ দিলেন তাই দিয়েই শুরু হ'ল বেলুড় মঠের কাজ। বিবেকানন্দেরই নির্দেশে

স্বামী ব্রহ্মানন্দ অধিষ্ঠিত হলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষের আসনে। সেদিন বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "রাখাল আজ থেকে এ সমস্ত তোর, আমি কেউ নই।"

একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।' সেই কথার সূত্রেই বিবেকানন্দ তাঁকে রাজামহারাজ বলে ডাকার সিদ্ধান্ত নেন। আর বেলুড় মঠ স্থাপনের পর তারই ওপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হন বিবেকানন্দ। সাধক ব্রহ্মানন্দ আবার হলেন কর্মযোগী ব্রহ্মানন্দ। দু'দশকের মধ্যে তিনি ভারতের প্রায় সর্বত্র উড়িয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নামের পতাকা। স্থাপন করেছিলেন উত্তরে, পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকটি কেন্দ্র এবং সেইসঙ্গে কাশী প্রভৃতি কয়েক জায়গায় সেবামূলক কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ যে সন্ন্যাসীদের একটা আখড়া নয়, নবযুগজীবন গঠনের একটা কেন্দ্র বিশেষ ব্রহ্মানন্দের সাংগঠনিক প্রতিভা তারই সাক্ষ্য বহন করছে। স্বামীজী বলেছিলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত—ওঠো, জাগো—মানুষ হও আর ব্রহ্মানন্দের কাজ ছিল সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া মানুষগুলিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর বাণী বহনের উপযুক্ত করে তোলা। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আশ্রমগুলিকে তিনি করে তুলেছিলেন সেবা ও সাধনার কেন্দ্র। তিনি বলতেন, "তোমাদের জীবন, তোমাদের মঠ সংসারতপ্ত নরনারীর আশা-ভরসা ও সান্ত্বনার স্থল হইবে। এইভাবে তোমাদের জীবন গঠন কর।"

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট হয়ে ব্রহ্মানন্দ হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির করেন উন্নতি, দক্ষিণ ভারতে স্থাপন করেন কয়েকটি নতুন কেন্দ্র। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত কাশীর অনাথ আশ্রমটিকে মিশনের অন্তর্ভুক্ত করে তার নাম দেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (১৯০৩)। ভাগলপুরে প্লেগের সময় (১৯০৪) তাঁরই নেতৃত্বে চালান হয় সেবাকার্য, বৃন্দাবনে স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (১৯০৭), বাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ আশ্রম (১৯০৯)। প্রচলন করেন মঠ ও মিশনের সর্বত্র রাম নামকীর্তনের। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থাপিত হয় কনখলে ১৯১২ সালে। এইখানে প্রবর্তিত হয় প্রথম দুর্গাপূজা। ঢাকায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিলান্যাস করেন ১৯১৬ সালে। পরের বছর ২০ জানুয়ারিতে মাদ্রাজে মঠের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯১৯ সালের অক্টোবরে দ্বারোদ্ঘাটন করেন তাঁর প্রিয় ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের। ১৯২১ সালে দ্বারোদ্ঘাটন করেন মাদ্রাজ মঠের রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের, প্রচলন করেন এখানে দুর্গাপূজার।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেরণা বিবেকানন্দ আর বিকাশকর্তা ব্রহ্মানন্দ। একই

সঙ্গে তিনি ধর্মার্থীদের দিয়েছেন পরমলোকের সন্ধান। আবার অন্ধ আতুরদেরও দিয়েছেন আশ্রয়। সেবা ও সাধন দুই একাকার হয়ে গেছে তাঁর জীবনের মধ্যে। তিনিই মঠে নিয়মিত কীর্তন ভজনের প্রচলন করেন। সব মিলিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তাকে সবদিক দিয়ে উপযুক্ত করার সাধনাতেও সিদ্ধ হন তিনি।

তাঁর জীবন ছিল ভোগবতী মন্দাকিনীর ধারা। সচ্চিদানন্দ গোমুখী থেকে উৎসারিত সেই ধারা গৃহী-সন্ন্যাসী-সাধক-সিদ্ধ-এই নানাখাতে প্রবাহিত হয়ে তাপিত তৃষিত জনকে তৃপ্ত করে লীলারঙ্গে একদিন শেষে মিশে যায় সেই সচ্চিদানন্দ মহা-সাগরেই। ব্রজের রাখাল একদিন কৃষ্ণদর্শনের মধ্য দিয়ে ব্রজেই ফিরে যাবে—শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য করে ১৯২২ সালের ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় "আমি ব্রজের রাখাল। আমায় নূপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব। এবারের খেলা শেষ হ'ল। কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। আহা তোদের চোখ নেই দেখতে পাচ্ছিস না—আমার কমলে কৃষ্ণ, পীতবসনে কৃষ্ণ! ব্রহ্মসমুদ্রে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে যাচ্ছি! ঠাকুরের পা দু'খানি কি সুন্দর। দেখ দেখ একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলোচ্ছে—বলছে আয়!" বলতে বলতে স্তব্ধ হলেন। তারপর ৮টা ৪৫ মিনিটে বলরাম বসুর বাড়িতে স্বরচিত প্রণাম মন্ত্র—যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং পুরুষং তথান্যে। বিশ্বোদ্‌গতেঃ কারণমীশ্বরন্ব, তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায়॥—উচ্চারণ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্র ব্রজের রাখাল—রাখাল মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ লীন হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে।

স্বামী শিবানন্দ

জয় জয় পরমাত্মন্ ত্রাহি মাং ভক্তিহীনং।
জয় জয় ভবহারিন্ রামকৃষ্ণ দ্বিবাহো॥

"বিবাহিত জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন শুধু ঠাকুরের জীবনেই সম্ভবপর হইয়াছিল।" বাগবাজার বলরাম মন্দিরে বসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন এই কথাটি বলেন তখন সেখানে উপস্থিত সবাই মাথা নেড়ে সায় দেন। শুধু ধ্বনিত হয় একটি কণ্ঠ,—ঠাকুর আমাকে এমন একটা বস্তু শিক্ষা দিয়েছিলেন যার জন্য আমার পক্ষেও তা সম্ভব হয়েছিল।

কথাটা শোনামাত্র স্বামীজীর দেহমনে, দৃষ্টিতে বচনে প্রবাহিত হয় শ্রদ্ধার এক ফল্গুধারা। ধীরকণ্ঠে তিনি বলেন, তবে ত আপনি মহাপুরুষ। আমি আপনাকে মহাপুরুষ বলে ডাকব।

সেদিন থেকে শুধু স্বামীজী নন, সবাই তাকে ডাকতে থাকেন মহাপুরুষ মহাপুরুষ মহারাজ নামে। বেলুড় মঠের মহাপুরুষ মহারাজ আর কেউ নন, তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ।

বিবাহিত হয়েও ব্রহ্মচারী, কঠোর তপস্বী হয়েও সুদক্ষ কর্মী-নেতা, আজন্ম ভগবৎ-প্রেমী এই মানুষটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বহুলোক। তাঁদের সেই মুগ্ধতাকে তিনি পরিণত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধায়। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোঁলা তার কাছ থেকেই জানতে চান শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে।

স্বল্পভাষী মহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দ সেদিন বেশি কথা বলেননি। শুধু লিখেছিলেন, "আমার নিজেরই তাঁর স্পর্শে ও ইচ্ছায় তাঁর জীবৎকালেই তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল।"

বেলজিয়ামের রাজা আলবার্ট বেলুড় মঠ পরিদর্শনে এসে পরিচিত হন স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে। সেই স্মৃতি স্মরণ করে রাজা বলেছেন, জীবনে এই প্রথম আমি এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম যাঁর সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনভাবে মানুষের মত কথা বলা যায়।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী

ইন্দিরা গান্ধীর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার মূলে রয়েছেন শ্রীমতী গান্ধীর মা। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহরু ছিলেন স্বামী শিবানন্দের দীক্ষিত শিষ্যা।

স্বামী শিবানন্দ ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত মানস-সন্তানদের অন্যতম। প্রথম দর্শনেই তিনি হন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত। তাঁর সেই প্রথম দর্শন সম্পর্কে স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, "আমার দর্শনের প্রথম দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় দেখেছিলাম। তারপর সমাধির ভাব কেটে গেলে তিনি ঐ বিষয়ে নিজস্ব ভাষায় বিশদভাবে আলোচনা করেন। তখন আমার অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করেছিলাম যে ঈশ্বরকে যিনি উপলব্ধি করেছেন সেই মানুষ আমার সম্মুখে।"

এটা ১৮৮০ সালের শেষ কিংবা ১৮৮১ সালের গোড়ার দিকের কথা। শিমুলিয়ায় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এই প্রথম দর্শন স্বামী শিবানন্দের জীবনের সবকিছুকে যেন উলটপালট করে দেয়। হৃদয়ের মধ্যে ওঠে নিরন্তর আবেগের এক ঝড়। তাঁর দেহ মন সবকিছু হয় মথিত। ঠাকুরের কাছে ছুটে যাবার জন্য তিনি হন আকুল। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। প্রথম দর্শনের পরের শনিবারই অফিস ছুটির পর নৌকো করে সোজা হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বরে। এক বন্ধুর বাড়িতে বিকেলটা কাটিয়ে তিনি যখন হাজির হলেন মন্দিরে সূর্য তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। যাবার বেলার লাল আলোয় রেঙে উঠেছে চারদিক। পশ্চিমের বারান্দায় তখন বসে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। কার যেন অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। এদিকে মন্দিরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসেন তিনি।

পশ্চিমের বারান্দায় উঠে তাঁকে প্রণাম করতেই ঠাকুর বলে উঠলেন, কে গো, কে তুমি?

আমি তারক, তারকনাথ ঘোষাল।

বাঃ বাঃ বেশ নাম, তারক, তারকনাথ। তা তুমি আমায় আগে কোথাও দেখেছ?

হ্যাঁ, শিমুলিয়ায় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে।

তা, বাইরে কেন, এসো, ঘরে এসো।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কোন উপায় নেই। ঠাকুর উঠে ঘরের মধ্যে ছোট্ট চৌকিটিতে গিয়ে বসলেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে তারকনাথের মনপ্রাণ উথাল-পাতাল। ও যে মা—মা যেন বসে আছেন চৌকির ওপর। তারকনাথ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাঁর কোলে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। আর তিনিও মায়েরই মত তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

কেটে যায় কয়েকটা মুহূর্ত। সন্ধ্যার সেই কালে চারিদিক নিস্তব্ধ। মূক তারকনাথ, নীরব শ্রীরামকৃষ্ণও। কিছু না বলে বহু কিছু বলার এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার মাধুর্যে তাঁরা তখন মাতোয়ারা। বেজে উঠল মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা। শুরু হ'ল আরতি।

স্খলিত পায়ে ঠাকুর এগিয়ে চললেন ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে। তাঁকে অনুসরণ করলেন তারকনাথ কিছুটা মন্ত্রমুগ্ধের মত। মন্দিরে এসে লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুর। কিন্তু তারকনাথের ব্রাহ্মচেতনা দিল দেবী প্রণামে বাধা। তবে সে মুহূর্তের দ্বিধা। সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন—সকল অঙ্গ ধুলায় মিশিয়ে মা'কে করলেন প্রণাম। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহমনে বয়ে গেল ভক্তির এক মন্দাকিনী।

তুমি সাকার মানো, না নিরাকার?

ঠাকুরের এ প্রশ্নে যেন সম্বিৎ আসে তারকনাথের। বলেন নিরাকারই আমার ভাল লাগে।

শক্তিকেও মানতে হয় গো, শক্তিকেও একটু মানতে হয়।

আরো কিছু অনুভব, আরো কিছু কথা; তারপর বিদায়ের পালা। ঠাকুর বললেন, আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাও না কেন?

না, বন্ধুকে বলে এসেছি, রাতে তার ওখানেই থাকবো। সে সব ব্যবস্থা করেছে—

সে তো ঠিক কথাই গো, তাকে হতাশ করবে কেন? তবে কাল আবার এসো।

ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন তারকনাথ। পরদিন রবিবার, অফিস ছুটি। কি উৎকণ্ঠায় কাটে সারাটা দিন। খেতে ভাল লাগে না, বসতে ভাল লাগে না, ভাল লাগে না গল্প করতে। সব সময়ই মন বলছে, চল যাই নিজ নিকেতনে—প্রণাম করে লুটিয়ে পড়ি ঠাকুরের পায়।

বিকেল বেলা আবার গেলেন তিনি মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বললেন, আজকের রাতে এখানেই প্রসাদ পাবে, এখানেই থেকে যাবে, কেমন?

তারকনাথের তখন, 'পাগলা ভাত খাবি? না হাত ধুয়ে বসে আছি' গোছের অবস্থা। এক কথাতেই তিনি রাজি। শুরু হ'ল দুজনের কথাবার্তা।

আর সম্ভবত সেই কথাবার্তার মধ্যেই ঘটল ঘটনাটা। ঠাকুর হঠাৎ তাঁর ডান পা'টা তুলে ঠেকিয়ে দিলেন তারকনাথের বুকে। মুহূর্তে মুছে গেল বিশ্ব সংসার। তারকনাথ দেখেন সর্বত্রই—তিনি। সংজ্ঞা হারান তিনি।

জ্ঞান ফিরতে দেখেন ঠাকুর হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর মাথায় পরম মমতায়—বলছেন, মা নেমে এস মা, নেমে এসো মা।

সেই মুহূর্তটির উল্লেখ করে পরবর্তীকালে স্বামী শিবানন্দ লিখেছেন, "ইহার ফলে আমার দিব্যজ্ঞানের দ্বার খুলিয়া গেল। ঠিক ঠিক উপলব্ধি করলাম, "আমি শাশ্বত চিরমুক্ত আত্মা, আর শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সেই সনাতন আদিকারণ ঈশ্বর। জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ। আমি এসেছি তাঁর সেবার জন্য।"

সেদিন ঠাকুরের সঙ্গ করে আনন্দে তারকনাথের সারা রাত আর ঘুমই আসে না। পার হয়ে যায় মুহূর্তগুলো আধো নিদ্রা আর জাগরণের মধ্য দিয়ে। তখন বোধকরি মাঝ রাত। তারক তাকিয়ে দেখেন ঠাকুর ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন—সম্পূর্ণ নগ্ন—কি সব যেন বলছেন বিড়বিড় করে। তারকের দিকে তাকিয়ে বলেন, কর রামনাম।

তারক গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলেন রামনাম। শেষ হয় রাত। আসে বিদায়ের ক্ষণ। ঠাকুর শুধু বলেন আবার এসো, একলা এসো।

সে ডাককে উপেক্ষা করার মত উপায় তারকের ছিল না। তিনি এসেছিলেন - আবার—আবার এবং একবারেই। শ্রীরামকৃষ্ণের হাত থেকে গৈরিক বসন নিয়ে একদিন তারকনাথের নামের খোলসটা ফেলে দিয়ে তিনি হন শিবানন্দ—স্বামী শিবানন্দ—সবার মহাপুরুষ মহারাজ।

স্বামী শিবানন্দ তাঁর ঠিকুজীটি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন তাই তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় না। জন্ম তারিখের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "আমি আনন্দস্বরূপ আত্মা। আমার আবার জন্মমৃত্যু কি? আমই বিক্রি হয়ে গেল, তা ঝুড়ির কি দরকার?"

তবু নানা সূত্র থেকে তার জীবন কাহিনী যা সংগ্রহ করা গেছে তা থেকে জানা যায়, ১৮৫৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে (সম্ভবত ১৬ নবেম্বর) বারাসতে তাঁর জন্ম। বাবা কানাইলাল (নাকি, রামকানাই,) ঘোষাল, মা বামাসুন্দরী দেবী। বাবা ছিলেন তান্ত্রিক, পেশায় মোক্তার। ছিলেন রানী রাসমণির আইন-বিষয়ক উপদেষ্টাও। সেই সূত্রেই তাঁকে মাঝে মাঝে আসতে হ'ত দক্ষিণেশ্বরেও। যখনই দক্ষিণেশ্বরে তিনি যেতেন গঙ্গায় স্নান করে পূজা করতেন দেবী ভবতারিণীর। সেই সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গেও হয় তাঁর সাক্ষাৎ—পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসহ্য গাত্রদাহে জ্বলছেন। তাঁর সেই দাহের কথা শুনে ঘোষালমশাই তাঁকে ইষ্টদেবীর কবচ ধারণ করতে বলেন। তাঁর পরামর্শ মত কবচ ধারণ করেই শ্রীরামকৃষ্ণ রেহাই পান গাত্রদাহের হাত থেকে।

ঘোষাল পরিবারে তখন অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু অভাব ছিল একটি সন্তানের।

বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন অপুত্রক। বারব্রত, পুরশ্চরণ করে বামাসুন্দরী দেবী ধর্ণা দেন তারকনাথের মন্দিরে। এই ধর্ণা দেবার কিছু দিন বাদেই জন্ম হয় তারকনাথের। তারকনাথের দোরধরা ছেলে তাই তাঁর নাম রাখা হয় তারকনাথ।

সুন্দর প্রিয়দর্শন তারকনাথ। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার শুরু বারাসতে মিশনারি স্কুলে। সেখান থেকে তাঁকে ভর্তি করা হয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। তারকনাথ মেধাবী, কিন্তু মনোযোগী নন। তবে পিতার মত সুকণ্ঠের অধিকারী তিনি। সঙ্গীতে এক সহজাত প্রতিভার অধিকারী তিনি।

ন' বছর বয়সে তারকনাথ মাতৃহীন হন। ১৪ বছর বয়সে যখন তিনি প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়ছেন, সেই সময় আক্রান্ত হন কঠিন ম্যালেরিয়ায়। আবার এই সময়েই পরপর দু'টি পারিবারিক মৃত্যুর ঘটনা তাঁর মনে আনল তীব্র বৈরাগ্য। কাউকে কিছু না বলেই একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ ভ্রমণে।

তাঁর সেই সময়কার মানসিক অবস্থার কথা জানা যায় তাঁরই লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন, "ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভাল লাগত না। প্রাণে ধর্মভাবও ছিল; আর কখনো বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হ'ব না, এ ভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। দেশ ভ্রমণ করব, নানা তীর্থাদি দেখে বেড়াব—এ ইচ্ছাটাও বোধ হয় জন্মগত ছিল। রেলে চাকরি করতাম আর ভগবানকে ডাকতাম।"

তিনি ভাবলেও, ভগবানকে ডাকলেও তাঁর বিধান ছিল অন্য, তাই শেষ পর্যন্ত তারকনাথকে আবদ্ধ হতে হয়েছিল বিবাহ-বন্ধনে। লেখাপড়ায় ইতি ঘটিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত তিনি রেলে চাকরি নেন। সেই চাকরির সূত্রেই থাকতে হয়েছিল তাঁকে মোগলসরাই, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি জায়গায়।

মা বামাসুন্দরী বেশ কিছুদিন আগেই তিন মাসের বোন নীরজাকে রেখে পরলোকগমন করেছেন। সে সময় এক রকম কোলেপিঠে করেই মানুষ করেছেন তিনি বোনকে। বামাসুন্দরীর মৃত্যুর পরই ঘোষাল পরিবারে হঠাৎ নেমে আসে অভাব অনটনের ছায়া। তারকনাথ যখন বিদেশে তখন পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। নীরজার বিয়ের বয়স হয় কিন্তু টাকার অভাবে তার বিয়ে দেওয়া যায় না। এমন সময় আসে একটি সম্বন্ধ আর সেই সম্বন্ধের সূত্র ধরেই বাবা চিঠি লিখলেন ছেলে তারকনাথকে, "বাবা তারক, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও নীরজাকে পাত্রস্থ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে চাপে পড়িয়া একটি বিনিময় বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। যে পরিবারে বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়াছে, তোমাকে সেই পরিবারের একটি কন্যাকে

অবশ্যই বিবাহ করিতে হইবে। আমি নিতান্ত নিরুপায় ও বাধ্য হইয়া অবস্থাচক্রে তোমার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছি।”

চিঠি পড়ে তারকনাথের তো মাথায় হাত। তিনি বিয়ে করবেন না বলে স্থির-প্রতিজ্ঞ। বাড়িতে বাবাকেও জানিয়ে দিয়েছিলেন সে কথা। তাঁরাও একরকম তাঁর কথা মেনেই নিয়েছিলেন, তার ফলে তারকনাথের মানসিক প্রস্তুতিটাও ছিল অন্যরকম। এখন তিনি যদি অরাজি হন, তাহলে বাবাকে কথার খেলাপের জন্য দোষের ভাগী হতে হবে, বোনের বিয়ে হবে না, সমাজে একটা দুর্ণাম রটবে। ওদিকে যদি বিয়ে করেন তাহলে নিজেকে হতে হবে ব্রতভঙ্গের অপরাধে অপরাধী—ব্যর্থ হবে আজন্মলালিত বাসনা। তাই বুঝতে পারেন না, কোন সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। মনের মধ্যে চলে দ্বিধাদ্বন্দ্বের খেলা।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নেন, সব কিছুই ঈশ্বরের বিধান। তিনি যে খেলা খেলাবেন সে খেলা খেলতেই হবে সবাইকে। তাঁর হাতে সবাই বাজীকরের সুতো বাঁধা পুতুলের মত। যেমন নাচাবেন তিনি, তেমনই নাচতে হবে সবাইকে। সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিলেন বাড়িতে।

নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে হয়ে গেল বোনের আর তিনিও বিয়ে করলেন বারাসতের কাছি-কাছি মহেশ্বরপুরের পঞ্চানন চাটুজ্যের ছোট মেয়ে সুলক্ষণা নিত্যকালীকে। তারকনাথ এই সময় রেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতাতেই ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানিতে চাকরি নেন। এইসময় কলকাতায় যে আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয় তার পাশের বাড়িতেই থাকতেন ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর প্রার্থনা, উপদেশ তারকনাথের ভালই লাগত। কিন্তু তেমন গভীরতা যেন পেতেন না তিনি। সবসময়ই প্রাণের মধ্যে একটা শুষ্কতা। বাড়ি ফিরে রাতে আকুল ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়তেন তিনি—ডাকতেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে।

তাঁর মনের যখন এই অবস্থা সেই সময়ই তিনি পান শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন। তাঁর সঙ্গে মিলনের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে পঞ্চবটীতে তারকনাথকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর বলেন, বের কর তোর জিভ।

তারকনাথ জিভ বের করতেই ঠাকুর তর্জনি দিয়ে তার ওপর লিখে দিলেন তাঁর বীজমন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে তারকনাথ ডুবে গেলেন সমাধিতে—চলে গেলেন এক অজানা রাজ্যে। বিভোর হলেন এক দিব্যানন্দে। এই শুরু।

অপত্যস্নেহে পরম মমতায় ঠাকুর টেনে নিলেন তারককে তাঁর বুকে। এসম্পর্কে স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, “আমাকে দেখলে তাঁর হৃদয় বাৎসল্যে ভরে উঠত। বুকের

মধ্যে টেনে নিয়ে কত আদর করতেন, ঠিক যেমন মা তাঁর শিশুকে আদর করেন। সে কি দিব্য অনুগ্রহ।"

আপন সন্তানের মতই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিতেন তাঁর মানস সন্তানদের। সামান্য ইঙ্গিতে তিনি তাঁদের মনের কালি ঘুচিয়ে দিতেন। সমাধান করতেন বহু সমস্যার। তখনও তারকনাথের বিয়ের এক বছর পার হয়নি। সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নির্দেশ দিতেন তাঁর সাধন জীবন সম্পর্কে। কথামৃতকার বলেছেন, "ঠাকুর তারককে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। তার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা কহিতেছেন। তারক অনেক কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের প্রতি)—সাধু সাবধান! কামিনীকাঞ্চন থেকে সাবধান। মেয়ে মানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার জো নাই। বিশালাক্ষীর দং যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না। আর এখানে এক একবার আসবি।

তারক—বাড়িতে আসতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখি তোর হাত দেখি।

এই বলিয়া ঠাকুর তারকের হাত কত ভারী দেখিতেছেন। একটু পরে বলিতেছেন, একটু আড় আছে - কিন্তু ওটুকু যাবে। তাঁকে একটু প্রার্থনা করিস, আর এখানে এক একবার আসিস। ওটুকু যাবে।

তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।"

ক্রমে ঠাকুরের প্রতি তারকনাথের আকর্ষণটা বাড়ল। এরই মধ্যে স্ত্রী নিত্যকালীর মৃত্যুতে সংসারের সঙ্গে প্রথম বন্ধনটা হ'ল ছিন্ন। ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে আরো দৃঢ়তা ব ঈশ্বর লাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেন তিনি সামনের দিকে। সাধন-ভজনের মধ্যে পেতে থাকেন অপার আনন্দ। ওই সময় গল্পচ্ছলে যে সব শিক্ষা তাঁদের দিতেন সেই শিক্ষা তাঁদের পরিণত করে বিশ্বজয়ী এক একজন বীর সন্ন্যাসীতে। ঠাকুরের সেই সব শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দ বলেন, "তখন আমরা অনেক সময় গঙ্গাতে শৌচাদি কার্যও করতুম। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সে কথা বলতে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি গো, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। তারপর আর কখনও গঙ্গায় শৌচাদি করিনি।"

১৮৮৫ সালে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে যখন কাশীপুর বাগান-বাড়িতে রয়েছেন সেই সময় নরেন্দ্রনাথ একবার বুদ্ধদেবকে নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। বুদ্ধদেবের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও তপস্যা সম্পর্কে বলতে বলতে নরেন্দ্রনাথ হঠাৎই বলেন, চল আমরা বুদ্ধদেবের

তপস্যাস্থল বুদ্ধগয়া দেখে আসি। তারকনাথ তাদের খরচ যোগাতে রাজি হলে একদিন নরেন্দ্রনাথ, তারকনাথ আর কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) বুদ্ধগয়ায় যান। সেখানে গিয়ে তিনজনে তপস্যায় বসলে একদিন নরেনদ্রনাথ দেখেন একটা তীব্র জ্যোতি বুদ্ধদেবের গা থেকে বেরিয়ে তারকনাথের অঙ্গে মিলিয়ে যায়। তাই দেখে নরেন্দ্রনাথ দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেন তারকনাথকে। তারপর তাঁর সে কি কান্না! তারক আশ্চর্য হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করেন কিন্তু নরেন সেদিন আর কিছু বলেননি।

এমনি নানা ঘটনার খাত বেয়ে এগিয়ে যায় জীবন গঙ্গার প্রবাহ। ঠাকুর নিজে নির্দিষ্ট করে দেন তাদের কর্ম ও গতি পথ। ঠাকুরের মরদেহ অবসানের পর সাময়িক অসহায়তা কাটিয়ে আবার যখন সবাই জড় হলেন বরানগর মঠে তখন তারকনাথও যোগ দিলেন তাদের সঙ্গে। ১৮৮৩ সালের শেষ ভাগেই স্ত্রী বিয়োগের পর তারকনাথ কলকাতার চাকরি ছেড়ে বারাসতে যান বাবার কাছে বিদায় নিতে। সেইসময় কানাইলাল (রামকানাই) তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার ভগবান লাভ হোক' স্বামী শিবানন্দর জীবনে বাবার সে আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি।

বরানগরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য মানস সন্তানরা যখন সন্ন্যাস নেন তখন তারকনাথ যোগ দেন তাদের সঙ্গে। এর আগে ঠাকুর যখন অসুস্থ সে সময় তারক নিয়মিত কাশীপুর বাগানবাড়িতে এলেও সেখানেই আশ্রয় নেননি। সে সময় হয়ত তাঁর কিছু দ্বিধা ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বললেন, ওরে তুই এই থাকের লোক এইখানেই আয় এবং নরেন যখন বললেন 'তারকদা আর কেন? এখানে এসে ঠাকুরের সেবায় জীবন সার্থক করুন।' তখন সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে তারকনাথ আশ্রয় নেন সেখানে আর তাঁর দেহত্যাগের পর বরানগর মঠেই নরেন প্রভৃতির সঙ্গে নেন সন্ন্যাস, হন স্বামী শিবানন্দ।

গৃহী জীবনের ইতি, শুরু সন্ন্যাস জীবনের। আর ঐহিক সুখের জন্য অর্থ সংগ্রহের সংগ্রাম নয়, এবার সেই ব্রহ্মকে পাবার জন্য পরমার্থের সাধনায় বসলেন তাঁরা।

সাধনার শুরু অবশ্য অনেক আগেই। মঠে আশ্রয় নেবার আগেই তিনি ছেড়েছেন ঘর। স্ত্রী বিয়োগের পরই চাকরি ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত রামচন্দ্র দত্তর কাঁকুরগাছির বাগান বাড়িতে একখানা মাত্র কম্বল সম্বল করে তিনি পড়ে রইলেন। পড়ে রইলেন বললে ভুল বলা হবে। পরম আনন্দের সন্ধানে পরমানন্দে বসলেন সাধনায়। সেই সময়কার কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে স্বামী শিবানন্দ একদিন বলেছিলেন, "ওহে! কাঁকুরগাছিতে যখন পড়ে থাকতুম বেশ নিরিবিলিতে থাকতুম। দিনের বেলায় দুটো ভাত জোগাড় করে খেয়ে নিতুম আর রাত্রে ধুনিতে দুখানা রুটি

পুড়িয়ে নিয়ে খেতুম আর একমনে সাধনভজন করতুম। তখন এ অঞ্চলে বড় কেউ লোক ছিল না। বাগানে শুধু একটা মালা ছিল। একা থেকে সাধানভজন করতুম।"

চিরবৈরাগ্য তারকনাথ স্ত্রী বিয়োগের পর যে মানসিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন তার কথা তিনি নিজেই বলেছেন, "সময় সময় মনে হ'ত ঠাকুরের সম্মুখে খুব কাঁদি। একদিন রাত্রিতে ম কালার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে খুব কাঁদলুম। এদিকে ঠাকুর আমাকে অনুপস্থিত দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নিকটে যেতেই বললেন, যারা ভগবানের জন্য কাঁদে তিনি তাদের কৃপা করেন। চোখের জলে পূর্ব জন্মের পাপ যে যায়। আর একদিন পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছি এমন সময় ঠাকুর সেখানে লেন। আমার দিকে তাকাতেই আমি কেঁদে ফেললুম। তিনি একটি কথাও না বলে রবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন আমার ভিতরে কি একটা যেন সুড়সুড় করে চলছে নে হল এবং সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকল। আমার এই অবস্থা দেখে ঠাকুর আনন্দিত হয়ে বললেন যে, আমার এ অবস্থা ভগবদ্ভাবের ফলে হয়েছে। অতঃপর আমাকে তার রে নিয়ে কিছু খেতে দিলেন। দৃষ্টি মাত্রেই তিনি ভক্তের অন্তরের সুপ্ত ধর্মবোধ াগ্রত করতে পারতেন।" সেদিন সেই মুহূর্তে ঠাকুরের স্পর্শে তারকের কুণ্ডলিনী ক্তি জাগ্রত হ'ল।

সেই শুরু। কিংবা বলা যায়, শুরু হয়েছিল আরও অনেক আগেই। সেটা ছিল কে আরও বেগবতী করার সাধনপথের সঠিক খাতে জীবন প্রবাহকে নিয়ে যাবার দেশ। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরানগর মঠে প্রথম যেদিন ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তরা রজা হোম করে সন্ন্যাস নেন, তারকনাথ সেদিন সে দলে ছিলেন না। দূর থেকে নি দেখেছিলেন সে দৃশ্য। কিন্তু তার অন্তরে ছিল সুতীব্র ত্যাগের গৈরিকে রাঙানো। ইরেও ছিলেন তিনি সুতীব্র ত্যাগী। বিধি নিয়ম পূজা প্রভৃতি তার প্রাণের বস্তু ছিল তাঁর প্রাণের ভাব ছিল 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব'। এই ভাবই ক্রমে ক্রমে বিকশিত ঘটিয়েছিল তাঁর আত্মদর্শন এবং পরে এই ভাবই রূপান্তরিত হয় বিশ্বপ্রেমে। লকে আপন করে নিয়ে সকলের কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর ব্রত।

বরানগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ত্যাগী ভক্তরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে ভাগ হয়ে েছিলেন দু'টি দলে। বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি চিহ্নিত হলেন 'দানার দল '।' জ্ঞানমার্গ হ'ল তাঁদের পথ—বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁরা বুঝতে চাইলেন সচ্চিদানন্দের স্বরূপ আর অন্যদল চিহ্নিত হলেন 'সখীর দল' হিসেবে। প্রেম নাই হ'ল তাদের পথ। তারকনাথ বা স্বামী শিবানন্দ ছিলেন এই দ্বিতীয় দলে। পূজাই ছিল তখন তাঁর সাধনার পথ।

সেই সময় এই সন্ন্যাসী ভক্ত দলের অন্তরে একটা দারুণ অতৃপ্তি—জানার একটা বিরাট আগ্রহ এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলনের, এবং গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার একটা তীব্র আবেগে তাঁরা ছটফট করতে থাকেন। সেই আবেগের মুহূর্তে তাঁরা সবাই প্রথমে উত্তীর্ণ হতে চাইলেন সাধনায়। আর সাধনার জন্য তাঁরা অনেকেই বেরিয়ে পড়লেন পথে। হিমালয়ের নির্জন গুহায় নিলেন আশ্রয়। আর যাবার পথে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে সঞ্চারিত করতে লাগলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেদিন সেই নবীন সন্ন্যাসীদের দেখে সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, ভালবাসায় মাথা করেছিলেন নত, সেদিন সেই নবীন সন্ন্যাসীদের কর্মকাণ্ডই সাধারণ মানুষকে টেনে এনেছি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের পথে।

অন্যান্য গুরুভাইদের মতো স্বামী শিবানন্দও বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ পর্যটনে। প্রথম পর্যায় তিনি গেলেন উত্তরাখণ্ডের তীর্থগুলিতে। যেখানে যান সেখানেই ভা হন বিভোর। দেব দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে থাকে তাঁর দেহে নানা সর্বাত্মক বিকার। কেদারনাথে গিয়ে ভাববিহ্বল মহাপুরুষ মহারাজ ভাবের ঘোরে দু হাত দিয়ে বিগ্রহকে আলিঙ্গন করে বহুক্ষণ ছিলেন ধ্যানমগ্ন। সেদিন সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে পুণ্যার্থী নিজেদের মনে করেছিলেন ধন্য। দেবদর্শনের পুণ্য ফল সেদিন যেন তারা হাতে হাতে পেয়েছিলেন।

১৮৯১ সালের শেষদিকে তিনি গেলেন দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি পরিদর্শনে। সেখানেও নানা জায়গায় ঘটেছিল ভাববিকার। তীর্থ পরিক্রমা শেষে মহাপু মহারাজ যখন কলকাতায় ফিরলেন রামকৃষ্ণ মঠ তখন বরানগর থেকে স্থানান্তরি হয়েছে আলমবাজারে। মঠে এসে পেলেন পিতার মৃত্যু সংবাদ। জন্মভূমি গিয়ে পিতার শ্মশানে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে করলেন পিতৃতর্পণ। শেষ হ'ল সেদি তাঁর মায়িক সংসারের আরেকটি বন্ধন। মহাপুরুষ মহারাজ সেদিন সবদিক থে মুক্ত।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সব তীর্থ পর্যটন করলেও ঘরের কাছে দু'টি তীর্থ পা তখনও ছিল তাঁর বাকি। সে দু'টি তীর্থ ঠাকুর আর শ্রীমা'র জন্মভূমি কামারপু আর জয়রামবাটি। তীর্থ ভ্রমণের দক্ষিণা দিতেই যেন তিনি এবার বেরোলেন ওই তীর্থে তার প্রণাম জানাতে। এবার তাঁর সঙ্গী ছিলেন শশীমহারাজ—রামকৃষ্ণান কামারপুকুর থেকে গেলেন জয়রামবাটিতে। মা সারদা তখন বাস কর জয়রামবাটিতে। সেখানে গিয়ে মা'র পায়ে মাথা ঠেকালেন তাঁর দু'টি সন্ত নিজেরাই একদিন রেঁধে খাওয়ালেন মা'কে। মা সে অন্ন গ্রহণে হলেন তৃপ্ত,

করলেন তাঁর সন্তানদের অন্তর—প্রাপ্তি আনন্দে ভরিয়ে দিলেন তাঁদের হৃদয়মন্দির সেই আলোকিত হৃদয় নিয়ে তাঁরা ফিরলেন আলমবাজার মঠে।

মঠে ভক্ত সন্ন্যাসীদের মনে তখন চলছে অনন্ত আনন্দের প্রবাহ। প্রত্যেক লোক সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা অনুরূপ মনে করে যথাসাধ্য সেবা ও শ্রদ্ধা করেন। তাঁরা তখন সবাই একসঙ্গে বসে জপ ধ্যান সাধনা করছেন কিন্তু অন্তরলোকে তাঁদের বয়ে যাচ্ছে এক একটি ভাব। আপন আপন ভাবে তাঁরা হচ্ছেন তখন পরিবর্ধিত। এর মধ্যে মহাপুরুষ ছিলেন এক ব্যতিক্রম। তিনি তখন ছিলেন এক সদানন্দময় রাজ্যের অধিবাসী। আপন আনন্দে 'কস্তুরী মৃগের মত' আপনি তিনি আত্মহারা। কোন বাধা তখন তাঁর কাছে আর বাধা নয়—কোন বন্ধন নয় বন্ধন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ' —এই মহাসূত্র তখন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতি কাজে—প্রতিবাক্যে। কিন্তু যখন ঈশ্বর না পাওযার বিরহ জ্বালায় জ্বলতে থাকে হৃদয় তখন দুচোখ বেয়ে নেমে আসে জলের ধারা—আকুল কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন তখন মহাপুরুষ মহারাজ,

> হরি গেল মধুপুরী হাম কুলবালা,
> বিপথ পড়ল সহি। মালতীমালা
> নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস
> সুখ গেল প্রিয় সাথে, দুঃখ মোহি পাশ।

কঠোর তপস্যায় তখন দিন কাটছে তাঁর। দেহাত্মবোধ শূন্য হয়ে তিনি তখন ডেকে যাচ্ছেন তাঁর ঈশ্বরকে। জপ নয়, ধ্যানের মধ্যে নিয়ত দেখতে চাইছেন আনন্দঘন সেই ব্রহ্মকে—তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে। এমনি একটা সময় স্বামী বিবেকানন্দর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন কলকাতায় তাঁকে এক বাড়িতে নিয়ে গা ধুইয়ে দিলেন। দেহাত্মবোধ শূন্য সন্ন্যাসীর দেহে মাটি জমেছে পরতে পরতে। বহুক্ষণ ধুইয়ে দেবার পর তাঁর স্বাভাবিক উজ্জ্বল বর্ণ আবার প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

মহেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁকে বলেন, একি করেছেন শরীরের। এত কাদা জমে রয়েছে অথচ কোন খেয়াল নেই।

স্বামী শিবানন্দ সেদিন একটু হেসে বলেছিলেন, সমস্ত রাত ধুনির পাশে বসে জপ করি আর দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটি ডুব দিয়ে আসি। গাও ঘসিনে—গাও মুছিনে, যেখানে সেখানে পড়ে থাকি তাই গায়ে এত কাদা লেগেছে। ওহে একটু গুল দাও দিকিনি। দাঁত মাজতে ভুলে গেছি।

এমন মানুষকে মহেন্দ্রনাথ আর কি বলবেন? অবশ্য বলার কোন অপেক্ষাও রাখেন

না তিনি। ওমনিভাবেই কাটতে থাকে দিন। মহাপুরুষ শিবানন্দ তখন ধ্যানেরই পক্ষপাতী। তিনি বলতেন, "আমি কিরূপ ধ্যান করি জান? মহাব্যোম বা মহাশূন্যের ভিতর আমি স্থির হয়ে আছি—সত্তা মাত্র আছে—দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে থাকি। এমন কি কোন চিন্তাই উঠতে দিই না। এক ভাবে স্থির, নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে, সত্তামাত্র অবলম্বন করে বসে থাকি। আমার এই ধ্যানটাই ভাল লাগে।"

কিছুদিন পরে বিবেকানন্দ আর শিবানন্দ মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। কাশী থেকে ঝুসীতে গিয়ে তাঁরা দুজনে বসলেন তপস্যায়। তাঁদের সেই তপশ্চর্যা যাঁরা দেখেছেন তারাই হয়েছেন বিস্মিত, স্তম্ভিত—ভক্তিতে অবনত। ডাক্তার গোবিন্দ-চন্দ্র বসু তাঁদের সেই সাধনার সাক্ষী। তিনি বলছেন, "এই দুইটি যুবক জ্বলন্ত পাবকের ন্যায়—যেমন জ্ঞান, তেমনি ধ্যান, তেমনি বৈরাগ্য। দু'জনে গিয়ে ঝুসীতে তপস্যা করতে লাগলেন। শুধু পা, আর গায়ে একখান ঘোড়ার কম্বল। তাঁরা কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। আমি এক একদিন গিয়ে দেখে আসতুম। লজ্জায় ক্ষোভে আমার হৃদয় আমার বুক ফেটে যেত। আমি জুতো মোজা পায়ে দিয়ে, গায়ে জামা ও আলোয়ান দিয়ে দুজনকে দেখতে যেতুম; কিন্তু এই দুটি দেবপ্রতিম যুবক শুধু পায়ে, একটি ঘোড়ার কম্বল গায়ে দিয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন। পায়ের গোড়ালি ফেটে গেছে। আমি সন্ধ্যার আগে বাড়িতে ফিরে আসতুম, কিন্তু আমার প্রাণটি সেখানে পড়ে থাকত।"

স্বামী শিবানন্দ নিজে তাঁর এই সময়কার তপস্যার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "কি দিন কি রাত্রির, একভাবে ধ্যানে কাটত। সকাল বেলা একবার ছত্রে গিয়ে খানকতক রুটি আর একটু ডাল আনতুম, কিন্তু তা দিয়ে খাওয়া চলে না। গোবিন্দ ডাক্তার মাঝে মাঝে একটু আনাজ তরকারি দিয়ে আসত। সেই আনাজ তরকারী বেঁধে মাঝে মাঝে একটু মুখ বদলাতুম।'

শুধু একবার নয় ১৮৯৩, ১৮৯৫ সালেও স্বামী শিবানন্দ বেরিয়েছিলেন তীর্থ পর্যটনে। ওই সঙ্গে চলেছিল তাঁর সাধনা। তাঁর সে সময়কার তপস্যায় ছিল একাগ্রতা, ছিল ঐকান্তিকত। তাঁর কথায়, "এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশি সঙ্গে থাকত না। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে।" তাঁর তপস্যার কঠোরতা, নিষ্ঠার কথা শুনে আমেরিকা থেকে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, 'তারকদা চমৎকার কাজ করিতেছেন—সাবাস। এই তো চাই।'

বহুতীর্থ ভ্রমণ করে ১৮৯৪ সালে স্বামী শিবানন্দ এলেন আলমোড়ায়। ওইখানেই বিখ্যাত ইংরেজ থিওজফিস্ট ই টি স্টার্ডির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। স্বামী শিবানন্দর

সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে তিনি মুগ্ধ হন। শিবানন্দ কিন্তু নিজের কথা বলেন নি, বলেছিলেন স্বামীজীর কথা, বলেছিলেন স্বামীজীর জীবনদর্শনে আরও সুন্দর, আরো সার্থক ভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে এই ধর্ম। স্বামী শিবানন্দের কাছ থেকে সব শুনেই স্টার্ডি দেশে ফিরে স্বামীজীকে আমেরিকা থেকে লণ্ডনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

বিবেকানন্দর চেয়ে শিবানন্দ ছিলেন বয়সে কিছু বড়। তাই বিবেকানন্দর প্রতি ছিল তাঁর অনুজের স্নেহ, ছিল শ্রদ্ধাও। স্বামীজী আমেরিকা বিজয় শেষে ভারতে ফিরছেন এই খবর পেয়ে তাঁর কলকাতা আসা পর্যন্ত শিবানন্দ আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। ছুটে গেলেন মাদ্রাজে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। সেখান থেকে তাঁরা দুজনে একসঙ্গে কলকাতায় ফেরেন।

এর কিছুদিন বাদে স্বামীজীর নির্দেশে শিবানন্দ সিংহলে গিয়ে এক বছর ধর্ম প্রচার করেন। সেইখানে মিসেস পিকেট নামে এক ইংরেজ মহিলা তাঁর কাছে বেদান্ত শেখেন। তিনি মহিলাটির নাম রাখেন ভগ্নী হরিপ্রিয়া। ভগ্নী হরিপ্রিয়া পরে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। ১৮৯৮ সালে তাঁরই উদ্যোগে কলম্বোতে বিবেকানন্দ সমিতি গঠিত হয়। সে সমিতি আজ সিংহলে হিন্দুধর্ম প্রচারের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে। কলম্বোকে কেন্দ্র করেই সারা সিংহলে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মজাল ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৮ সালের শেষে তিনি মঠে ফিরে আসেন। মঠ তখন বেলুড়ের ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছে।

ওই বৎসরেই কলকাতায় প্লেগ মহামারী দেখা দিলে স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী শিবানন্দ ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি প্লেগ রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সেবাকাজের সময় দেখা যায় শিবানন্দর আরেকটি রূপ। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে তিনি রোগীদের সেবা চালিয়ে যান।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরলে স্বামী শিবানন্দ তাঁর সঙ্গে অমরাবতীতে যান। বিবেকানন্দ তাঁকে পিলিভিটে অর্থ সংগ্রহের জন্য রেখে আসেন। প্রায় ওই সময়েই ভিঙ্গারাজ কাশীতে বেদান্ত প্রচারের জন্য বিবেকানন্দের হাতে পাঁচশ টাকা দেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন শিবানন্দকে ওই টাকা দিয়ে কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই যখন কাশীতে অদ্বৈত আশ্রমের উদ্বোধন হয় সেইদিনই স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন।

১৯০২ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই আশ্রম পরিচালনা করেন। তখন বেশিটা সময়ই কাটাতেন ধ্যানে। অদ্বৈতাশ্রমে তিনি একটি পাঠশালা খুলে

কয়েকটি হিন্দুস্থানী ছেলেকে ইংরেজি পড়াতেন। এইসময় স্বামী বিবেকানন্দর চিকাগো বক্তৃতাও তিনি হিন্দীতে অনুবাদ করেন।

১৯০১ সালেই স্বামী বিবেকানন্দ যে ট্রাস্ট দলিল করে তাঁর ১১ জন গুরুভাইকে মঠের অছি করেন স্বামী শিবানন্দ ছিলেন তাঁর অন্যতম। ১৯০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশন রেজিস্ট্রী করা হয়। সেই থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি মিশনের কোন না কোন পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭ সালে স্বামী প্রেমানন্দ অসুস্থ হলে স্বামী শিবানন্দ কার্যত বেলুড় মঠের ভার নেন। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ করলে স্বামী শিবানন্দকেই মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। অবশ্য ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে তিনি মঠের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ওই বছরই তাঁকে কাশী ছেড়ে বেলুড়ে চলে আসতে হয়। ১৯২২ থেকে ১৯৩৪ সালে অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ১২ বছর তিনি ছিলেন সংঘের অধ্যক্ষ। মঠ ও মিশনের ইতিহাসে এই ১২ বছরকে শিবানন্দ যুগ হিসেবে অভিহিত করা যায়।

১৯২৪ সালে ১০ মাসেরও বেশি সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও ভাবধারা প্রচার করেন তিনি। ওই সময়ই বোম্বাই, নাগপুর ও উটকামাণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শিলান্যাস করেন তিনি। তিনি যখন মাদ্রাজে সে সময় কাবেরী নদীর বন্যায় প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সে সংবাদে বিচলিত মহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রাণকাজে। দক্ষিণ ভারতে মিশনের এধরনের কাজ এই প্রথম। শিবজ্ঞানে জীব সেবা— সেদিন দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি মানুষের দুয়ারে হাজির হয়েছিল এক নতুন বার্তা নিয়ে।

স্বামী শিবানন্দ বরাবরই বলতেন, 'গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড়'। বিভিন্ন সময়ে মানুষের প্রতি তাঁর দরদ, তাঁদের সেবায় তাঁর আত্মনিয়োগ, নিষ্ঠা দেখে একথা বুঝতে কারো কষ্ট হয় না যে, মহাপুরুষ মহারাজের গঙ্গাপূজার চেয়ে মানুষ পূজা বড় কোন মুখের কথা নয়, এ তাঁর চরম উপলব্ধির কথা।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি কথাকে তিনি ধ্রুব সত্য বলে মানতেন, জীবনের প্রতিটি কাজে সেই সত্যকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। স্বামী বিবেকানন্দর ভাবনাচিন্তার সঙ্গেও রয়েছে তাঁর সাযুজ্য তবু সব রকম অনুকরণের তিনি ছিলেন চরম বিরোধী। তাঁর স্পষ্ট কথা নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে সাধন-ভজন করবে। অপরকে শ্রদ্ধা করবে কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব কখনও নাশ কোরো না। তাহলে কিছুই হবে না। যে যে পরিমাণ ব্যক্তিত্ব রেখে সাধন করবে, তার সেই পরিমাণ উন্নতি হবে।

'নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ কর্মী' মহাপুরুষ মহারাজ নিজের 'হৃদ্গত শক্তি দিয়া' অপরের হৃদয়ে

আনতেন কর্মের প্রবাহ। "তিনি স্থির না হইয়াও চঞ্চল ছিলেন। একস্থানে থাকিয়াও সর্বত্র বিরচণ করিতেন; বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াও করিতেন।" এই চিন্তার রূপ পেত তাঁর কর্মে, তাঁর বাক্যে। বিচিত্র ছিল তাঁর জীবনধারা। "তিনি যে (সামাজিক) পুরাতন ধারার বিরোধী ছিলেন তাও নয়—তাহাও তিনি মানিতেন; কিন্তু যেখানে অবশ্যক বিবেচনা করিতেন, সেখানে পুরাতন ধারা বন্ধ করিয়া দিয়া নূতন ধারার প্রবর্তন করিতেন। তিনি সময়োপযোগী আবশ্যক পরিবর্তন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। গোঁড়ামি বিধিনিষেধ তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না এবং অনাবশ্যক পরিবর্তন বা হৈ চৈ করাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। যেখানে যেটুকু আবশ্যক তিনি সেই টুকুই পরিবর্তন করিতেন। এই জন্য তিনি এত লোকরঞ্জন হইয়াছিলেন।"

তাঁর কাছে বেলুড় মঠ ছিল 'ভারতের মহামানবের সাগরতীর।' এখানে কোন ভেদাভেদ তিনি সহ্য করেননি, সবাইকে টেনে নিয়েছেন বুকে। তাঁর কথা, দেখ! এটা ঠাকুরের দরবার। ভগবান লাভ, সাধন ভজন—এই হ'ল এখানকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রাখ ও সাধন ভজন কর—এইটাই হচ্ছে দেখবার জিনিস। বামুন কি কায়েৎ, কি বাগ্দী একথার কোন অবশ্যক নেই; কারণ এখানে কুটুম্বিতা করা বা বিবাহাদি দেওয়া বা সামাজিক অন্য কোন কাজ করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে হ'ল সাধন ভজনের স্থান, সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সংস্রবই নেই। যে ঠাকুরকে মানবে, সাধন ভজন করবে, সেই এখানে থাকতে পারবে। জাতাজাতাতির কথাটা এখানে হওয়া উচিত হয়।

স্বামী শিবানন্দকে বলা হত 'এ ম্যান অব গড'—ঈশ্বরের মানুষ। এই ঈশ্বরের মানুষটি সবার মধ্যেই দেখতেন ঈশ্বরকে আবার তেমনি নিরভিমান ভাবেই করে যেতেন কাজ। অসংখ্য কাজের মধ্যে বাপৃত রেখেছেন নিজেকে, অসংখ্য মানুষকে দিয়েছেন মুক্তি পথের সন্ধান কিন্তু নিজেকে কখনও করেননি অহমিকার ভাবে অবনত। নিরাসক্তি এবং নিরাভিমানিতা ছিল তাঁর অঙ্গের ভূষণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজে ব্রতী হয়েও শিবানন্দ বলতেন, "ভরত যেমন বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য পরিচালনা করিতেন, তিনিও সেইরূপ রাজামহারাজের পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া সংঘের সকল কার্য পরিচালনা করিতেছেন। কি আশ্চার্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি। প্রশান্ত চিত্ত, শান্তরজো বৃত্তি, আত্মরতি, নিষ্পাপ, সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি সম্পন্ন, জীবন্মুক্ত যোগী শিবানন্দ তাঁহার সংঘ পরিচালনা কার্য বিস্ময়কর ভাবে শুরু করিলেন।"

৬৮ বছর বয়সে তিনি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের গুরুভার কাঁধে তুলে নেন। অথচ

তখনও যুবকের মত তাঁর কর্মোদ্যম দেখে অবাক হয়েছেন সবাই। নানা জায়গায় গেছেন, বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন, বহুজনের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দর চেষ্টায় যে সংঘজীবন সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত ও দৃঢ়মূল হয়েছিল মহাপুরুষ মহারাজের চেষ্টায় তার কর্মভূমি হয়েছিল আরও প্রসারিত আরো কল্যাণকর। বলা যায় "শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে যে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল সেই শক্তি স্বামী বিবেকানন্দর ভিতর দিয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের ভিতর দিয়া তাহা জনসাধারণের ভিতর সংবেশিত হইয়াছিল।"

ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টোর স্ত্রী লেডি মিন্টো এসেছেন বেলুড় মঠে। তাঁকে স্বাগত জানালেন স্বামী শিবানন্দ। একথা সেকথার পর লেডি মিন্টো জানতে চাইলেন, এই সংঘ কি প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করেছিলেন।

স্বামী শিবানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "নো ইট ইজ নট স্বামীজী অর এনি আদার ডিসাইপিল হু ইজ রেসপনসেবল ফর ইট। ইট ইজ শ্রীরামকৃষ্ণ হিমসেলফ হু ইনিসিয়েটেড দি অর্ডার ডিউরিং হিজ লাস্ট ইলনেস অ্যাট কাশীপুর।" স্বামী শিবানন্দর এই কথা থেকে বোঝা যায় বিবেকানন্দর মত তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলার তাৎপর্য।

সহজ সরল শিবানন্দর মনে যখন যা আসত তাই তিনি বলতেন, কোন আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির ওপর তিনি তেমন গুরুত্ব দিতেন না। সেবার মহীশূরের রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গেছেন স্বামী শিবানন্দ। মহারাজ তাঁর সভাসদদের নিয়ে বসে আছেন। শিবানন্দ এলেন, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসেই তিনি মূত্রত্যাগের প্রয়োজন অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি মহারাজকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে? স্বাভাবিকভাবে মহারাজকে একথা জিজ্ঞেস করাটা রীতিমত অপমানজনক। শিবানন্দর কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। আর মহীশূরের মহারাজাও আগে থেকে এখানের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে একথায় কিছু মনে করেননি।

এই সহজ সরল মানুষ শিবানন্দর মধ্যেও ছিল রঙ্গ-রসিকতার একটি স্বতঃস্ফূর্ত ধারা। বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব পি সি লায়ন এসেছেন বেলুড় মঠে। শিবানন্দ তাঁকে প্রাথমিক আপ্যায়নের পর বললেন, আচ্ছা মিঃ লায়ন, আপনি এখন খাঁচার বাইরে এসেছেন। তাঁর কথায় সবাই একটু হকচকিয়ে যান। মিঃ লায়ন কিন্তু কৌতুকটির রস গ্রহণ করে বলেন, হ্যাঁ স্বামীজী, আমি এখন পিঞ্জরমুক্ত হতে চাই।

আবার একদিন শিবানন্দ তাঁর গুরু ভাইদের একটা গ্রুপ ফটো দেখছিলেন। তাঁর মধ্যে তাঁর ছবিও ছিল। ছবিটি দেখে হাসতে হাসতে তিনি সকৌতুকে বললেন, "এ আবার কে? সাধু সঙ্গে থেকে শালা সাধু হয়ে গেছে। ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ৬ জনকে ঈশ্বরকোটি বলতেন। আমি এতবড় উচ্চস্তরের ছিলাম না। কিন্তু গুরু কৃপায় আমিও ঈশ্বরকোটি হয়ে গেছি।"

আসলে শিবানন্দ ছিলেন দেহবোধশূন্য। তাঁর ব্রাহ্মীস্থিতি ছিল সুদৃঢ়। তাই শেষ বয়সে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখনও কেউ তাঁকে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "আমি এখন চলতে পারি না। দেহটি অথর্ব হয়ে গেছে। তাতে কিছু আসে যায় না। আমি মহানন্দে আছি। গুরু মহারাজের কৃপায় আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেছি।" বলতেন, "আমি নিঃসংশয়ে জানি, আমি শরীর নয়, আমি জন্মমৃত্যুজরা ব্যাধিহীন আত্মা। শরীরটা আমার খোলস, আমার কষ্ট হবে কি করে? আমি ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন ছিলাম।"

শরীর তাঁর ক্রমেই খারাপ হতে উঠলে ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার আসার খবর পেয়ে তিনি বললেন, "ডাক্তার আমাকে কি দেখবে? আমি তো নিরাকার।"

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শিবানন্দ বসে চিঠি পড়ছেন। এমন সময় একটি ভক্ত এসে প্রণাম করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, কেমন আছেন?

কেমন আছি? আমি ভাল আছি। শরীর কিন্তু ভাল নেই, তবে আমি ভাল আছি। আমি সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা। বলতে বলতেই ভাবাবিষ্ট হন শিবানন্দ।

এই সচ্চিদানন্দময় পুরুষ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ছিলেন এমনই একনিষ্ঠ যে সর্বদাই জপ করতেন তাঁর নাম। বিশ্বাস করতেন তিনি আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই সব। তাই কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করত, দেহরক্ষার পর আপনি কোন লোকে যাবেন? অমনি তিনি নির্দ্বিধায় উত্তর দিতেন, ঠাকুরের কাছেই যাবো।

একবার নিমতার এক ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনার সন্তানাদি কি?

শিবানন্দ মুহূর্ত দেরি না করে বললেন, ঠাকুর। ঠাকুরই ছেলে, বাবা, মা সব। পরে বললেন, এই যুগে মা রামকৃষ্ণ নামেই অধিক প্রসন্ন। যে রামকৃষ্ণ নাম নেবে তার মঙ্গল হবে। তাঁর নাম নিয়ে তাঁর দুয়ারে পড়ে থাকলে একদিন না একদিন অবশ্যই তাঁর জয় হবে।

আবার একদিন এক ব্রহ্মচারী তাঁকে প্রণাম করে বলেন, 'আমার মনে হয় আপনারা স্তোকবাক্য দিয়ে আমাদের দিয়ে সংঘের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভ করবার জন্য আমাদের সাধনভজন করতে হবে।' কথাটা শুনেই তিনি বললেন,

"আরে একি আমি বলছি, আমার মুখ দিয়ে ঠাকুর বলছেন, আমার মধ্যে আমি নেই, জাগ্রত জীবন্ত ঠাকুর রয়েছে। আমার মুখ দিয়ে যা বলেন বিশ্বাস কর পূর্ণ হয়ে যাবে।...তাঁর কথা বিশ্বাস কর, আর চিন্তা কর। তোদের আর কিছু করতে হবে না। তাতেই তোদের দেবত্বলাভ হবে।"

গুরুর প্রতি এমনি ছিল তাঁর দৃঢ় ভক্তি, আস্থা। আবার এমনিভাবেই তিনি ভক্তদের সন্তাপ করতেন হরণ, তাঁদের চিত্তকে করতেন মালিন্যমুক্ত। কলকাতার এক বড়লোকের ১৮ বছরের একমাত্র ছেলেটি হঠাৎ মারা যাওয়ায় বাবা বিশেষ করে মা শোকে প্রায় পাগল হয়ে যান। দিনরাত্তির তিনি শুধু 'বংশী, বংশী' বলে ডাকেন আর কাঁদেন। ভদ্রলোক শেষে স্ত্রীকে নিয়ে আসেন মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। ভদ্রমহিলা তাঁর পায়ে মাথা রেখে আকুলভাবে কেঁদে বলেন, বাবা, আমার বংশীকে কি আর একটিবার দেখতে পাব না ?

মহাপুরুষ মহারাজের চোখে তখন করুণার সাগর। তিনি ধীরকণ্ঠে কণ্ঠে বললেন, ঠাকুরের ইচ্ছে হলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার ছেলেকে একবার দেখতে পাবে। তাঁর সান্ত্বনা আর আশীর্বাদে আশ্বস্ত মা-বাবা বাড়ি ফিরে গেলেন। দিন দুই পরে আবার তাঁরা এলেন, এবার কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। হৃদয়ে আর শোক নেই। সারা দেহে ছড়িয়ে রয়েছে প্রশান্তি। এসেই তাঁরা মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বললেন, আপনার কৃপায় আমরা আমাদের ছেলেকে দেখতে পেয়েছি আমাদের শোকও দূর হয়েছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের বংশী এখন বাঁশী, বাজাচ্ছে। খেলা করছে। সেখানে সে সুখেই আছে। আপনার দয়ায় আমরা আমাদের মৃত পুত্রকে দেখলাম, শ্রীকৃষ্ণেরও দর্শন পেলাম, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য।

এই হলেন মহাপুরুষ মাহারাজ—স্বামী শিবানন্দ। তিনি অধ্যক্ষ থাকার সময়ই ১৯২৬ সালে বেলুড়ে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহা সম্মেলন। সে সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন তিনি।

১৯২৭ সালের ২৮ জানুয়ারি বেলুড়মঠে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দর সমাধি মন্দিরের। ১৯২৫ সালে জানুয়ারি মাসে বোম্বাইতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শিলান্যাস করেন। ১৯২৬ সালে দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের নতুন ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

জীবনের শেষ দুটি বছর তিনি যুগ ধর্ম প্রচারে সমস্ত দেহ মন প্রাণকে নিবেদন করেছিলেন। তিনি সব সময়ই বলতেন, 'প্রভুর তৈরি এই সংঘ; এর কাজ বহু শতাব্দী ধরে চলবে। ১৯২৯ সালে ১৩ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজন্মতিথিতে নতুন বেলুড় মন্দিরের শিলান্যাস করেন তিনি।

ক্রমশ দেহ তাঁর অপটু হয়ে আসে। সে সময়েও তিনি বলতেন, 'আনন্দময় জগৎ—সর্বত্র আনন্দ দেখছি ; আমি মহানন্দে আছি, তবে দেহটা বড় জীর্ণ হয়েছে, মাঝে মাঝে গোলমাল করে। ওদিকে মন না দিলেই হয়। আবার কখনও বা বলতেন, 'দেহটার আর কি আছে ? যা করবার সে করছে। তবে অকারণে এটাকে ফেলে দেবার আবশ্যকতা নেই। যতদিন থাকে, থাক। এজন্য মনকে বিশেষ চঞ্চল করবার দরকার নেই। দেহটা হচ্ছে জপ, ধ্যান, সাধন ভজন করবার একটা উপকরণ। সে সব কাজ খুব করছে। তবে, যখন ইচ্ছে হবে, একবারে সমাধিতে চলে যাব, দেহটা আপনি খসে পড়বে।'

এল ১৯৩৪ সাল। ২৫ ফেব্রুয়ারি যথারীতি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজা। তাঁর পাঁচদিন পর ২০ ফেব্রুয়ারি ১৩৪০ সালের ৮ ফাল্গুন স্বামী শিবানন্দ—বিবেকানন্দর মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমানন্দসাগরে লীন হয়ে গেলেন চিরদিনের মত।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

সর্বায় সর্বপরায় সর্বভাব স্বরূপিণে।
সর্বভাবহীনায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

ওরে আয়, আয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উপায় কোথায়? ঘর ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যান ভবতারিণীর মন্দিরে। পেছনে মন্ত্রমুগ্ধের মত আসে যুবক।

ঠাকুর তখন ভাবাবিষ্ট। ভাবের ঘোরেই তিনি যুবককে মন্দিরের ভিতরে টেনে বলেন, দেখ দেখ চৈতন্যময় শিব কেমন শুয়ে আছেন।

বিস্ফারিত নেত্রে দেখে যুবক। ওদিকে মা কালীর গয়না ঠিক করতে করতে ঠাকুর ধরলেন গান,

নেবে নাচ খ্যাপা মাগী
বাজবে যে মহেশের বুকে
মরে নাই শিব, বেঁচে আছে।

তন্ময় ঠাকুরের ভাবের ছোঁয়া লাগে যুবকের মনেও। সেই মুহূর্তে যুবক দেখে তার ইষ্টমূর্তিকে।

সেদিনের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি চিরদিন অম্লান ছিল যুবক গঙ্গাধর পরবর্তীকালে স্বামী অখণ্ডানন্দের মণিকোঠায়। সেই মুহূর্তটির কথা বলতে গিয়ে পরেও তিনি ভাবে হতেন গদগদ। বলতেন, "ঠাকুর সেদিন কি আনন্দই প্রাণে ঢেলে দিলেন। তিনি বলছেন দেখ, দেখ আর আমরা তাই দেখছি।"

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা বিতরণ এই প্রথম নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলার, তাঁর কাছে আসার সুযোগ হয়েছিল যুবক গঙ্গাধরের সম্ভবত ১৮৮৩/৮৪ সালে। সাক্ষাৎ হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন তাঁকে সেখানে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু হরিনাথ—পরবর্তী জীবনের স্বামী তুরীয়ানন্দ।

তার আগেও অবশ্য একবার গঙ্গাধর দেখেছিলেন ঠাকুরকে বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়িতে।

সেদিন তাঁর মুখে শুনেছিলেন নানা জ্ঞানের কথা। শুনে ভেবেছিলেন, লোকে বলে, ইনি নাকি পাগলা বামুন, লেখাপড়া তেমন জানেন না? তা হলে এমন কথা বলেন কি করে? সে জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি নিজেকে দিতে পারেননি। অন্তরে তখন তাঁর উঠেছিল ঠাকুর সম্পর্কে এক তীব্র আকর্ষণের তুফান। সেদিন কিন্তু তিনি ঠাকুরের মুখোমুখি হতে পারেননি।

তারপর আবার এলেন। এলেন দক্ষিণেশ্বরে বন্ধু হরিনাথকে সাথী করে। ঠাকুর তখন বসে আছেন তাঁর ঘরটিতে সেই ছোট্ট তক্তপোষটির ওপর। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন ভক্তের দল। জানলা দিয়ে এসে পড়ছে শেষ বিকেলের রোদ। গঙ্গাধর অবাক হয়ে দেখেন এই 'মুখ্যু বামুন' সেদিনও সবাইকে সহজ সরল কথায় শোনাচ্ছেন ঈশ্বরেরই কথা। তিনি আগের প্রসঙ্গের জের টেনে বলছেন, "এ যা বললুম সব বিচারের কথা। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচার। সব স্বপ্নবৎ বড় কঠিন পথ। এ পথে তাঁর লীলা স্বপ্নবৎ, মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আমিটাও উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে না। বড় কঠিন। এসব বিচারের কথা ভক্তদের বেশি শুনতে নেই। তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে ভক্তির উপদেশ দেন—শরণাগত হতে বলেন। ভক্তি থেকে তাঁর কৃপায় সব হয়। তিনি লীলা করছেন—তিনি ভক্তের অধীন। কখনও ঈশ্বর চুম্বক হয়, ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনো ভক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে নেয়—তিনি ভক্তবৎসল—ভক্তাধীন।"

কথা বলতে বলতে বিকেলের সূর্য লাল হয়ে ওঠে অস্তাচলে। সন্ধ্যা নামে ধীরে। ভক্তরাও একে একে প্রণাম করে বিদায় নেয়। মন্দিরে বাজছে আরতির ঘণ্টা। হরিনাথ গেছেন সেখানে মা'র আরতি দেখতে। একটু আগেও যে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল বহু মানুষের নিঃশ্বাসে। সে ঘর তখন ফাঁকা। না, ফাঁকা নয়, সে ঘরে তখন রয়েছেন দু'জন—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর ২০ বছরের এক যুবক গঙ্গাধর। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন—একদৃষ্টে। একটু পরেই ঠাকুর হেসে বললেন, আয়, কাছে আয়।

আবিষ্টের মত এগিয়ে যায় যুবক গঙ্গাধর। ঠাকুর তার চিবুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হ্যারে তোর নাম কি?

গঙ্গাধর ঘটক।

কোথায় থাকিস?

কলকাতায়।

আমাকে এই প্রথম দেখলি, না আগেও দেখেছিস।

এর আগে দেখেছি বাগবাজারে দীননাথ বসুব বাড়িতে।

তা বেশ বেশ। আজকের রাতটা তুই এখানেই থেকে যা। তুই যে এখানকারই লোক। আজ তুই মা'র প্রসাদ পাবি। এখন যা, মা'র আরতি দেখে আয়।

গঙ্গাধর যান ভবতারিণীর মন্দিরে। আরতি তখনও শেষ হয়নি। দু চোখ ভরে দেখেন তিনি মা'র রূপ। শেষ হয় আরতি। হরিনাথ বলেন, এবার চ' ফেরা যাক।

গঙ্গাধর বলেন, না রে, আজ রাতে আর ফেরা হবে না। ঠাকুর বললেন, আজকের রাতটা তাঁর কাছেই থাকতে।

তুই তো দেখছি মহাভাগ্যবান। ঠাকুরের অশেষ কৃপা দেখছি তোর ওপর।

কপালে হাত ঠেকায় গঙ্গাধর। হরিনাথ বলেন, তুই তাহলে আজ রাতে এখানেই থাকছিস।

হ্যাঁ ভাই, তুই একটু বাড়িতে বলে দিস।

দেবোরে দেবো, নিশ্চয়ই দেবো।

সে রাতে হরিনাথ ফিরে যান, থাকেন গঙ্গাধর। সে রাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে নিজের হাতে পেতে দিলেন গঙ্গাধরের শোবার জন্য মাদুরখানা, গুঁজে দিলেন মশারি। এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর অনুভূতিতে আবিষ্ট গঙ্গাধর পরদিন সকালে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, এবার তাহলে যাই।

গভীর অনুরাগে ভরা চোখ দু'টি তুলে ঠাকুর তাঁকে বললেন, আবার আসিস। এই শনিবারেই আসিস। ওরে, মাঝে মাঝে এসে এখানে রাত্রিবাস করে যাস ভাল হবে, চৈতন্য হবে।

সত্যিই সেদিন চৈতন্যর দুয়ার খুলে গিয়েছিল গঙ্গাধরের। বামুনের ছেলে তিনি। ছোটবেলা থেকেই সাত্ত্বিক ভাবের অধিকারী। কিন্তু আজ তাঁর সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে একটা প্রচণ্ড শূন্যতা আবার ঠাকুরকে কাছে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন তিনি। এই আকাঙ্ক্ষাই একদিন তাকে ঘর থেকে টেনে আনে পথে—শ্রীরামকৃষ্ণের চরণছায়ায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আশ্রয়ে তিনি খুঁজে পান তাঁর জীবনের পরমকে। জীবে শিব—এই সত্যে বিশ্বাসী হয়ে মানুষের মধ্যেই খুঁজে পান নারায়ণকে।

গঙ্গাধরদের আদিবাড়ি যশোরের নড়াইল মহকুমার ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে। কিন্তু শতাব্দীপূর্বে তাঁর পূর্বপুরুষরা সেখান থেকে কলকাতার বাগবাজারে এসে বাস করতে

থাকেন। বাবা শ্রীমন্ত ঘটক ছিলেন নিষ্ঠাবান, সাধক, পণ্ডিত। তর্করত্ন উপাধি লাভ করেছিলেন তিনি। কুলাচার্যের কাজ করে কাটত দিন। মা বামাসুন্দরী ছিলেন স্নেহশীল ধর্মভীরু মহিলা। খুব ছোট বেলাতেই গঙ্গাধর একবার গৃহত্যাগ করেন। সে সময় 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলে কেঁদে তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে যান। ছেলেকে খুঁজতে সে সময় তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। কাশীতে এক কিশোর ব্রহ্মচারীকে দেখে 'এই আমার গঙ্গা' বলে তিনি জড়িয়ে ধরেন তাকে, নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে। এ ভুল ভাঙার পরও সন্তানজ্ঞানেই তিনি ব্রহ্মচারীকে ভালবাসতেন।

১২৭১ সালে ইংরেজি ১৮৬৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন আহেরিটোলার মানিকতলা ঘাট স্ট্রীট মামার বাড়িতে গঙ্গাধরের জন্ম। সম্ভবত পার্বণ শ্রাদ্ধের সেদিন সবাই ব্যস্ত ছিল। এমন সময় বামাসুন্দরীর প্রসব বেদনা ওঠে। তিনি কাউকে কিছু না বলে একটি ঘরে একাই শুয়ে পড়েন। পাশেই পড়েছিল একটা কুশাসন। একটু পরে সেই কুশাসনের ওপরই তিনি প্রসব করেন সন্তান। একদিন যিনি বৈরাগ্যকে বরণ করে ছাড়বেন ঘর, তাঁর আগমন হল এইভাবে এ যেন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

শৈশব অতিক্রম করে বাল্য ও কৈশোরে প্রবেশ করার সঙ্গে গঙ্গাধরের মধ্যে বাড়তে থাকে কৃচ্ছ সাধনের ঝোঁক।

উপনয়নের পর আরও তীব্র হয় সে ঝোঁক। নিজের জীবনের একটা ছক যেন তিনি নিজেই তৈরি করে ফেলেন—ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাস্নান, প্রাণায়াম অভ্যাস, গীতাপাঠ, স্বপাক আহার, হরতকি খাওয়া ইত্যাদি হ'ল তাঁর নিত্যকর্মের অঙ্গ। আরো মজার কথা, এসব কাজে তাঁকে উৎসাহ দিতেন স্বয়ং পিতা। ছেলের বৈরাগ্য সাধনের পথে বাধা না হয়ে তিনিই তাঁকে ঠেলে দিতেন প্রকৃত বৈরাগ্যের দিকে। আর তাঁর এইসব কাজে আরেক সহায় ছিলেন বাল্যবন্ধু হরিনাথ। খেলাধুলা, বন্ধুবান্ধব কোন কিছুকেই তিনি এড়িয়ে চলেন নি কিন্তু লক্ষ্যটা রেখেছেন ঠিক। কোন সময়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি তিনি। শারীরিক বলে হীন হয়েও মানসিক বলের গুণে বন্ধু মহলে তিনি দিতেন নেতৃত্বের ভূমিকা। যে কোন বিবাদ বিসম্বাদে সবাই মেনে নিত তাঁরই মধ্যস্থতা।

সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি গঙ্গাধরের ছিল একটা সহজাত টান। কোথাও কোন সাধু এসেছে শুনলেই অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটতেন তাঁদের কাছে, জানতে চাইতেন তাঁরা কোথা থেকে আসছেন। দূর হিমালয় তাঁকে তখন থেকেই যেন হাতছানি দিত। ওই বয়সেই একবার তো এক সাধুর সঙ্গে তিনি বর্ধমান পর্যন্ত চলে যান। সেবার একমাস বাদে তিনি ফিরে আসেন ঘরে। এই সাধুসন্তদের আকর্ষণেই প্রথম তিনি

গিয়েছিলেন দীননাথ বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এবং তারপর দক্ষিণেশ্বরে আবার—বারবার।

দেবমানবের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে দেবশিশুর মধ্যেও ঘটতে থাকে রূপান্তর। ধীরে ধীরে যেন খসে পড়তে থাকে কৃচ্ছ্রসাধনের অঙ্গ। অন্তর্হিত হতে থাকে গোঁড়ামির ভাব। ঠাকুর তাঁকে একদিন কথা প্রসঙ্গেই বললেন, "ত্যাখ এসব গোঁড়ামি ভাব সেকেলে। ঈশ্বর কি অত শুকনো জিনিস? তিনি যে রসের সাগর; আনন্দের মহাসমুদ্র। সব সময় তাঁকে সেই ভাবেই চিন্তা করবি। ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দময়—তিনি কেন অনাহারী উপবাসী হতে যাবেন। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে এত বাদবিচার করবি কেন? নরেনকে ত্যাখ। কী বড়ো বড়ো তার চোখ। দিনের মধ্যে সে একশোটা পান খায় আর যা পায় তাই খায়। কিন্তু গভীর অন্তর্মুখী তার মন। কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘর বাড়ি গাড়ি ঘোরা যা কিছু সে দেখতে পায়-দেখে সবই ঈশ্বরে পরিপূর্ণ। যা একদিন সিমলেতে গিয়ে নরেনকে দেখে আয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সে নির্দেশ অবহেলা করেননি গঙ্গাধর। তিনি গিয়েছিলেন শিমুলিয়ার দত্তবাড়িতে পরদিনই। গিয়ে দেখলেন নরেন্দ্রনাথকে। দেখলেন বড়লোকের ছেলে—চারিদিকে বিলাসের সামগ্রীরও অভাব নেই কিন্তু তারি মধ্যে নিরাসক্ত একজন মানুষকে। বেশভূষা পারিপাট্যহীন, চুল অবিন্যস্ত। বসে একখানা বই পড়ছেন। কি গভীর—কি আত্মনিবিষ্টভাবে- তা না দেখলে কল্পনাও করতে পারতেন না সেদিন গঙ্গাধর। সেদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে পুরোপুরি একটা অন্যমানুষ হয়ে ফিরে এলেন গঙ্গাধর। সেদিন থেকেই নরেন্দ্রনাথ হয়ে গেলেন তাঁর জীবনের 'হিরো।'

সে দিনের সেই আলাপের কথা বলতে গিয়ে পরবর্তী কালেও যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন গঙ্গাধর। তিনি বলতেন, "শিমুলিয়ায় দত্তবাড়িতে প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম নরেনের সঙ্গে আলাপ করতে সেদিন প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার বিশাল চোখ দুটি; বিকচপদ্মের মতো মানুষের এমন সুন্দর চোখ হয় আমার ধারণা ছিল না। সে তখন একটি বিরাট আয়তনের ইংরেজি বই পড়ছিল নিবিষ্ট চিত্তে। ঘরটি ধূলি-মলিন, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দেখে মনে হলো তার মন এই পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন কোথায় চলে গেছে। তারপর থেকে ঠাকুর আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি যেন প্রায়ই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি। তখন থেকেই তার প্রতি আমার স্থায়ী ভক্তির সূচনা এবং তখন থেকেই সে আমার জীবনের 'হিরো' হয়ে ওঠে।"

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার কয়েকদিন বাদে গঙ্গাধর গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। যেতেই গভীর আগ্রহে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কি রে গিয়েছিলি—নরেনের কাছে ?

হ্যাঁ।

কি দেখলি ?

দেখলাম যেমন তেজস্বী তেমনি সত্ত্বগুণী। যেমন অন্তর্মুখী দৃষ্টি, তেমনি বাহ্য বিষয়ে উদাসীন।

বা—বা। একবার দেখেই ঠিক বুঝেছিস তো। তোর তো দেখছি খুব বুদ্ধি। তা যাবি বুঝলি, মাঝে মাঝেই যাবি নরেনের কাছে। আর ওর সঙ্গে খুব করে মিশবি।

ঠাকুরের কথা শুনেছিলেন গঙ্গাধর। খুব করেই মিশেছিলেন বিবেকানন্দর সঙ্গে। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজকে করে ছিলেন জীবনের আদর্শ। বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন বিবেকানন্দর অকৃত্রিম স্নেহ। বিবেকানন্দ তাঁর এই প্রিয় ভক্ত ভাইটিকে কখনও গঙ্গা বলে ডাকতেন না, ডাকতেন গ্যানজেস বলে।

ঠাকুরের চিহ্নিত সন্তানদের মধ্যে গঙ্গাধর এসেছিলেন প্রায় শেষ পর্বে। তাই ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ লাভের সুযোগ তিনি পাননি। কৃপা পাওয়ার কিছুদিন পরেই ঠাকুরের গলায় দেখা গেল ক্যান্সার। আর সবার মত আসন্ন বিয়োগের কৃষ্ণ ছায়ায় গঙ্গাধরের হৃদয়ও হ'ল ভারাক্রান্ত। কাশীপুর বাগানবাড়িতে গঙ্গাধর যখন পারেন তখনই ছুটে আসেন, ঠাকুরের সেবায় ধন্য করেন নিজেকে, সংগ্রহ করেন পরম ধন। তখন গুরু সেবার মধ্য দিয়েই চলে তাঁর সাধনা।

এদিকে ঠাকুরও তাঁর এই চিহ্নিত সন্তানদের একসঙ্গে থাকার জন্য, সংঘজীবন যাপনের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন, দিতে থাকেন নানা পরামর্শ। ওই সময়েই বুড়ো গোপালদার দেওয়া বারখানি গেরুয়ার মধ্যে এগার খানি তিনি নিজের হাতে তুলে দিলেন তাঁর এগারজন প্রিয় ভক্তকে। একখানি কাপড় তুলে রাখলেন গিরিশ ঘোষের জন্য। আরেকদিন ঠাকুর গঙ্গাধরকে গেরুয়া কাপড় দিয়ে বললেন, তুই পারবি।

ছোট্ট দু'টি কথা, 'তুই পারবি'। কিন্তু তা যেন গঙ্গাধরের সারা অন্তরকে তোলপাড় করে তুলল। ঠাকুর বলেছেন, 'পারবি'—এই কথাকে সত্য করায় দায়িত্ব যে তাঁর—তাঁকে পারতেই হবে—হতে হবে সার্থক সন্ন্যাসী। ছোটবেলা থেকে যে বৈরাগ্য তাঁকে পথে টেনে আসছে, এই মুহূর্তে তার টান যেন হল আরো তীব্র।

ঠাকুরের তিরোভাবের পর একটা শূন্যতা যেন সবাইকে গ্রাস করল। অনেকেরই মনে হ'ল যে সংঘবীজ ঠাকুর বপন করেছিলেন তা বুঝি আর অঙ্কুরিত হ'ল

না। কিন্তু না, বরানগর মঠে ঘটল তার অঙ্কুরোদগম। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন সেখানে থেকেই চালিয়ে যেতে থাকলেন সাধন ভজন। গঙ্গাধরও মাঝে মাঝেই আসেন। গুরুভাইদের সঙ্গে কখনও মঠে কখনও কাশীপুরের শ্মশানে ধ্যান ভজন করে সময় কাটাতেন-অন্তরে কিন্তু তখন তাঁর এক প্রচণ্ড হাহাকার- আর কি ঠাকুরের দেখা পাবো না। যদি পাই—তাহ'ল কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাবো ?

কোথায় ঠাকুরের দেখা পাবো ?- এই ভাবনা যখন গঙ্গাধরের অন্তরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে— সেই সময় হঠাৎই যেন তার হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠল। অন্তরাত্মা যেন বলে উঠল-- তিনি আছেন তার দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় ? কেন হিমালয় তো দেবতাদের আবাসভূমি সেখানেই আছেন ঠাকুর—সেখানেই দেখা পাওয়া যাবে তাঁর। গঙ্গাধর ঠিক করলেন, তিনি হিমালয় পরিভ্রমণে যাবেন।

সেটা ১৮৯৬ সাল। গঙ্গাধরের তখন মাত্র ২২ বছর বয়স। ওই বয়সে গৃহত্যাগের পথে প্রথম বাধা আসে বাড়ি থেকে, কিন্তু গঙ্গাধরের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এ ব্যাপারে তাঁর সহায় হলেন তাঁর বাবা। তিনি নিজে ছেলেকে তুলে দিলেন ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে এসে এবং আশীর্বাদ করেন তোমার ঈশ্বর লাভ হোক। মনে প্রাণে চেয়েছিলেন, ছেলে সন্ন্যাসী হোক - হোক প্রকৃতই সন্ন্যাসী। তাই একবার আলমবাজার মঠে ছেলের খোঁজ নিতে এসে শুনলেন, ছেলে খেতড়ির রাজ প্রাসাদে অতিথি। তখন তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, "শুনিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী রাজার অতিথি ?" বৃদ্ধের সে দিনের সেই কথা শুনে বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের বলেছিলেন- দেখছিস ব্রাহ্মণের কি ত্যাগের ভাব। গঙ্গাধর ঋষিপুত্র।

তীর্থ ভ্রমণের প্রথম পর্বে গঙ্গাধর যান বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশীও অযোধ্যা। সেখান থেকে হরিদ্বার, হৃষীকেশ হয়ে একদিন যাত্রা করেন গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর পথে। কেদার বদ্রী দর্শনের পর তিনি যান চন্দ্রবদনী, তুঙ্গনাথ, ত্রিযুগীনারায়ণ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থে। এই সব তীর্থভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী গঙ্গাধর প্রকাশ করেছেন তাঁর 'তিব্বতের পথে হিমালয়' বইতে। তাঁর চোখে হিমালয় তখন কোন পাহাড় নয়, হিমালয় চিন্ময়, অনন্ত অনাদি এক শিবলিঙ্গ।

একরাত চাঁদের আলোয় চারদিক যখন আলোকিত সেই সময়ে এক পাহাড় চূড়ায় গঙ্গাধর ধ্যানমগ্ন। অকস্মাৎ তিনি অনুভব করলেন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর প্রাণের ঠাকুর। পরে ঠাকুর গাইছেন তাঁর প্রিয় গান। গঙ্গাধরের অনুভূতিতে প্রকাশ পেল—হিমালয়— এই বিশ্বজগৎ—সবই শিবশক্তির নিত্যলীলা স্থল। সেই অনুভূতি জুড়িয়ে দিল গঙ্গাধরের মনপ্রাণের সব জ্বালা। তিনি বুঝলেন তাঁর

ঠাকুর সবসময়েই আছেন তাঁর সঙ্গে। দুর্গম পথে বিপদের মুখে তিনিই রক্ষা করেছেন তাঁকে। পরবর্তীকালে গঙ্গাধর যখন স্বামী অখণ্ডানন্দ—তখন এই সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, "ঠাকুর আমায় দেখে'ছন কিনা পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছে করে বিপদের পথে যেতেন, প্রতিবারই তিনি হাসতে হাসতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।" তীর্থ পর্যটনের এই পর্বে গঙ্গাধর তিব্বত পর্যন্ত যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হবার পর বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যখন সন্ন্যাস নেন, গঙ্গাধর তখন সে দলে ছিলেন না। পরে তাঁকে একদিন বিবেকানন্দ বলেন, দ্যাখ গ্যাঞ্জেস, আমরা ত বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিয়েছি। তুই ছিলি না, আয় এবার তোর বিরজা হোম হয়ে যাক। সন্ন্যাস নিলেন গঙ্গাধর। গঙ্গাধরের অখণ্ড ব্রহ্মচর্য জীবন লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ তাঁর নাম রাখেন অখণ্ডানন্দ। মুছে গেল গঙ্গাধরের পূর্বজীবন। এখন থেকেই তিনি হলে স্বামী অখণ্ডানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে অখণ্ডানন্দই প্রথম হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে যান। স্বামী বিবেকানন্দ এই ঘটনা লক্ষ্য করেই লিখেছেন, 'তাহাদের (শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের) একজন নগ্নপদে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের বিশ হাজার ফুট গিরিপথ লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। দুঃখকষ্ট তাহাকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছে। পুলিশ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়াছে, জেলে আটক করিয়াছে, নির্দোষ জানিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছে।" এটা অবশ্য স্বামী অখণ্ডানন্দের দ্বিতীয় বার তিব্বত থেকে ফেরার সময়ের ঘটনা। সেবার তিব্বত থেকে তিনি যখন কাশ্মীরের পথে ফিরছিলেন সে সময় পুলিশ তাঁকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করেছিল।

তিব্বতে গিয়ে অখণ্ডানন্দ তিব্বতী ভাষাও শিখেছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র দাসের অনেক আগেই অখণ্ডানন্দ তিব্বতে যান। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর এই ভ্রমণ পথের কাহিনী প্রায় নিয়মিতভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে লিখে জানাতেন। সেইসব কাহিনী পড়ে বিবেকানন্দের মনেও হিমালয় ভ্রমণের বাসনা তীব্র হয়। পরিব্রাজক জীবন শেষে গাজীপুর থেকে বরানগর মঠে ফিরেই বিবেকানন্দ চিঠি লিখলেন অখণ্ডানন্দকে, বললেন অবিলম্বে মঠে ফিরে এস। জীবনের 'হিরো' ফ্রেণ্ড ফিলজফার এবং গাইডের সে নির্দেশ অমান্য করতে পারলেন না অখণ্ডানন্দ। তিনি ফিরে এলেন বরানগর মঠে। সেটা ১৮৯০ সালের কথা। এখানে ফিরেও সারাক্ষণও চলত তাঁর হিমালয় ভ্রমণের সেইসব কাহিনীর বর্ণনা এবং অনুধ্যান। একসময় বিবেকানন্দ তাঁকে বললেন, চ গঙ্গা, এবার আমিও তোর সঙ্গে যাব হিমালয়ে। এক কথায় রাজি অখণ্ডানন্দ। ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে তাঁরা রওনা হলেন হিমালয়ের পথে।

কর্ণপ্রয়াগ হয়ে বদ্রীনাথ দর্শনের পর তাঁরা ফিরে এলেন হৃষীকেশে। সাধুসন্তদের তপস্যাধন্য এই জায়গাটি ছিল স্বামীজীর খুবই প্রিয়। এবারের এই হিমালয় ভ্রমণের পথে অখণ্ডানন্দ এবং বিবেকানন্দ মাঝেমাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃষীকেশে তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এখানে কিছুদিন তপস্যার পর গাড়োয়ালের টিজরিতেও তাঁরা কিছুকাল তপস্যা করেন। এইখানেই স্বামী অখণ্ডানন্দ বুকের অসুখে পড়েন। ডাক্তাররা বিধান দেন, আর তাঁর পাহাড়ে ঘোরা চলবে না, এবার সমতলে গিয়ে চিকিৎসা চালাতে হবে। হৃষীকেশে থাকার সময় বিবেকানন্দরও জ্বর হয়। ফলে তিনিও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন। সব মিলিয়ে সে যাত্রা তাঁদেব আব হিমালয়ে থাকা হয় না। চলে আসেন মীরাটে। এখানে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন তাঁদের আরো কয়েকজন গুরুভাই।

শাস্ত্রপাঠ আর তপস্যার মধ্য দিয়ে দিনগুলি সেখানে বেশ ভালই কাটছিল কিন্তু বিবেকানন্দ একদিন হঠাৎ বললেন, আর নয়, এবার আমি একাই পরিব্রাজনে যাব। কেউ যেন আমায় অনুসরণ না করে।

বিবেকানন্দ রওনা হয়ে গেলেন একাই। তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘনের সাহস হ'ল না কারো। কিন্তু অখণ্ডানন্দ তাঁর এই প্রিয় গুরুভাইকে একা ছেড়ে দিযে কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাই দিনতিনেক বাদে তিনিও বেড়িয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য বিবেকানন্দর অন্বেষণ, সাথী হিসেবে পথে তাঁর পরিচর্যা করা। কিন্তু কথায় বলে, ভাল কাজে বাধা অনেক। মীরাট থেকে কাথিয়াবাড়ের কচ্ছে পৌছে নারায়ণ সরোবরের কাছে ডাকাতের হাতে পরেন অখণ্ডানন্দ। নিরীহ সন্ন্যাসী দেখে ডাকাতরা অবশ্য পরে তাঁকে ছেড়ে দেন। অখণ্ডানন্দ আসেন মাণ্ডবীতে। এখানেই বিবেকানন্দর দেখা পান তিনি।

স্বামীজী কিন্তু অখণ্ডানন্দকে দেখে তেমন রেগে উঠলেন না শান্ত গলায় শুধু বললেন, দেখ আমি একা বেড়াতে চাই। একা ঘুরতে ঘুরতেই আমি দেশের প্রকৃত দুরবস্থাব কথা জানতে পেরেছি। প্রতিকারের উপায়ও আমি চিন্তা করছি। হয়ত এর জন্য আমাকে বিদেশেও যেতে হবে। দেশের কাজের জন্য সত্যি যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর তাহালে সেটাই হবে আমাকে যথার্থ ভালবাসা, সঙ্গে ঘুরে সেবা করাটা নয়।

সে কথা শুনে একটু চুপ করে রইলেন অখণ্ডানন্দ। তারপর বললেন, দেখ তোমাকে দেখার জন্য মনটা বড় ছটফট করছিল তাই তোমাকে দেখতে এসেছি এখন ভ্রমণ করতে পার।

এখন থেকে দুই সন্ন্যাসী আবার রওনা হলেন দুই পথে। মাণ্ডবী থেকে অখণ্ডানন্দ এলেন জামনগরে। এখানে প্রথমে এক শেঠজী পরে ঝণ্ডু-ভণ্ডজীর আয়ুর্বেদ ভবনে থাকতেন। এইখানে থাকতেই অখণ্ডানন্দজী দেখলেন নিঃস্বার্থ সেবা কাকে বলে। কবিরাজী ঝণ্ডু-ভণ্ডজীর জীবিকা হওয়া সত্ত্বেও দুঃস্থ মানুষদের তিনি সেবা করতেন অকাতরে। তাঁর এই সেবাকাজ নাড়া দেয় অখণ্ডানন্দর হৃদয়কে। তাঁর ধারণা দৃঢ় হয় এইভাবে মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ভগবান।

জামনগরে এক বছর থেকে অখণ্ডানন্দ এলেন খেতড়িতে। তিনি হলেন রাজঅতিথি। প্রজাদের দুঃখদুর্দশা দেখে আর স্থির থাকতে পারেন না অখণ্ডানন্দ। ভাবেন এদের জন্য যদি কিছু করতে না পারি তবে কি হবে এই তপস্যার? মানসিক এই অবস্থার কথা জানিয়ে এক দীর্ঘ চিঠি তিনি লিখলেন স্বামীজীকে। স্বামীজী তখন আমেরিকায়। অখণ্ডানন্দ তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের এই রকম জনসেবা করা উচিত, না পরিব্রাজকের জীবন কাটিয়ে দেওয়াই কর্তব্য। চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে এতটুকু দেরি করলেন না স্বামীজী। সে চিঠিতে তিনি লিখলেন—"বর্তমান যুগে মূর্খ, দরিদ্র, পীড়িত ও দুঃখী জনগনের সেবার জন্য সন্ন্যাসীদের নিজের মুক্তির আকাঙ্খা পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।" লিখলেন, 'ভাই গঙ্গা তোমার সংকল্প সিদ্ধ হোক, ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।"

আর কোন দ্বিধা নয়, নয় কোন চিন্তা। মন যা করবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল তার প্রতি যখন মিলেছে স্বামীজীর অকুণ্ঠ সমর্থন তখন আর দেরী কেন? অখণ্ডানন্দ ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে। সে কাজের প্রথম ভূমি হ'ল খেতড়ি।

অখণ্ডানন্দ চিন্তা করে দেখলেন, মানুষের যা কিছু দুঃখ, দারিদ্র-তার মূলে রয়েছে অশিক্ষা। শিক্ষার আলোতে মানুষের হৃদয় যদি আলোকিত করা না যায় তবে তাদের শত ধর্মের কথাই বলা হোক না কেন, সবই হবে বৃথা। তাই তিনি প্রথমেই সেখানে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। খেতড়ির রাজবাড়ির সঙ্গেই ছিল একটা স্কুল। কিন্তু সে স্কুলটি যেন থাকতে হয় তাই ছিল। সেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল যেমন কম, তেমনি শিক্ষাদানের, মানও ছিল খুব নিচু। সবচেয়ে বড় কথা আন্তরিকতা বস্তুটি না ছিল শিক্ষকদের না ছাত্রদের। এই অবস্থায় মহারাজের সঙ্গে কথা বলে অখণ্ডানন্দ এই বিদ্যালয়ের সংস্কারে হাত দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৮০ থেকে বেড়ে হ'ল ২০৭ শিক্ষকদের মধ্যে এলো শিক্ষা দেবার আগ্রহ। ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকরা হলেন শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন।

খেতড়িতে অখণ্ডানন্দ ছিলেন মাত্র ছ'মাস। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি খেতড়ির

আশেপাশে গ্রামাঞ্চলে পাঁচ স্কুল খুললেন, যে রাজ্যে শিক্ষার জন্য ছিল না কোন নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ। সেই রাজ্যের মহারাজ তাঁর কথায় শিক্ষাখাতে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ করলেন।

নিজের কর্মক্ষমতার গুণে স্বামী অখণ্ডানন্দ খেতড়ির মহারাজের মনে এমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তিনি সেখানে ছোটখাট একটা বিপ্লবই ঘটিয়ে দেন। এতদিন পর্যন্ত রাজদরবারে প্রজাদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রজারা সরাসরি জানাতে পারত না মহারাজকে তাদের অভাব অভিযোগের কথা, মহারাজ দেখতে পেতেন না তাদের প্রকৃত অবস্থা। সমস্ত কিছুই চলত এক্টা ভায়া মিডিয়া।' সেই মাধ্যমের অবসান ঘটালেন অখণ্ডানন্দ। তাঁর কথাতেই মহারাজ তাঁর রাজদরবার প্রজাদের জন্য করলেন অবারিত। শুধু এই নয়, অখণ্ডানন্দ খেতড়িতে ছ মাস থাকার মধ্যেই গোড়াপত্তন করেন আরো বেশ কিছু জনহিতকর কাজ। তিনি সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরও সেসব কাজ চলতে থাকে যথারীতি—বরং তাতে লাগে গতি, প্রাণের ছোঁয়া।

খেতড়ি থেকে উদয়পুর, আলোয়ার প্রভৃতি রাজপুতনার আরো কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণ করেন অখণ্ডানন্দ। সর্বত্রই দেখেন সেই একই ছবি অশিক্ষা, দারিদ্র, হাহাকার। তিনি এইসব অঞ্চলেও গরিবদের জন্য স্থাপন করেন বেশ কয়েকটি স্কুলের।

ওদিকে বরানগরের মঠ তখন উঠে এসেছে আলমবাজারে। স্বামী অভেদানন্দ ততদিনে হৃষীকেশ থেকে বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করে ফিরে এসেছেন। মঠে ফিরে তিনি গুরুভাইদের বেদান্ত পড়াচ্ছেন। বৈদান্তিক মতবাদে গুরুভাইদের সবাইকে শিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে অভেদানন্দ চিঠি লিখলেন অখণ্ডানন্দজীকে—বললেন, এবার মঠে ফিরে আসুন মঠে আপনার প্রয়োজন রয়েছে। সে ডাকে সাড়া দিয়ে ১৮৯৫ সালে অখণ্ডানন্দ ফিরে এলেন মঠে।

মঠে বেদান্তচর্চায় বেশ আনন্দেই কাটতে থাকে। এর মধ্যে স্বামীজীর ডাকে অভেদানন্দ গেছেন ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারের জন্য। আর এই সময়ই দুটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন অখণ্ডানন্দ। যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে তাঁর প্রকৃত পথটি দেখাবার জন্যই এই দুটি ঘটনা ঘটান।

একদিন প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন অখণ্ডানন্দজী। নানা ভাবে চেষ্টা করেও যন্ত্রণা এতটুকু কমাতে পারলেন না। এই সময়ই মনে পড়ে তাঁর অধীত বেদান্তের কথা। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তের সাধন অনুযায়ী চিন্তা করতে থাকেন কে আমি, এটা কার শরীর? আমি তো শরীর নই, মন নই—আমি অনন্ত অব্যয় আত্মা। এই রকম

চিন্তায় কেটে যায় কিছুটা সময়। ধ্যানের মধ্যে তিনি যেন দেখেন হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছেন বালগোপাল আর পিছনে পিছনে ছুটে আসছেন আলুলায়িত কুন্তলা মাতা যশোদা হাতে তাঁর ননী। আবার দেখলেন, গোপাল আর যশোদার পেছনে আবির্ভূত হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি অখণ্ডানন্দকে ওই গোপাল ও যশোদা মূর্তি দেখিয়ে বলেন, দেখ দেখি কি সুন্দর ভাব। মুহূর্তে গোপাল ভাবে আবিষ্ট হলেন অখণ্ডানন্দ। আকুল ভাবে তিনি বলতে লাগলেন, "চাই না নির্বাণ, চাই না মুক্তি। এই গোপাল ভাব আস্বাদন করব। এর জন্য যদি বার বার জন্মালেও দুঃখ নেই। ভাবের ঘোরে তিনি গোপাল যশোদা এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে যেই ধরতে গেলেন অমনি সব মিলিয়ে গেল।' শান্ত হয়ে অখণ্ডানন্দ বুঝলেন, জ্ঞান নয়, ভক্তি, সেবাই হচ্ছে তার পথ।

অন্য একদিনের কথা। গরমকাল। মঠের বড় ঘরে একটা মাদুর পেতে শুয়েছেন তারা সবাই। প্রচণ্ড গরমের জন্য ঘুমোতে পারছেন না কেউই। বাইরে একটুকু হাওয়া নেই। কেমন যেন একটা গুমোট ভাব। খানিক্ষণ ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে উঠে পড়লেন অখণ্ডানন্দ। একটা বড় পাখা টেনে নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন সবাইকে। একটা তৃপ্তিতে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন সবাই। তারই মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ অনুভব করলেন তার কোথাও একটুকু ক্লান্তি নেই। তিনি যেন তৃপ্ত, চরিতার্থ। দশের সুখে আমার সুখ—এই ভাবটি অনুভব করলেন তিনি প্রাণে প্রাণে।

সেবাধর্মে বিশ্বাসী তিনি সেই ছোটবেলা থেকেই। সেই সময়েও কোন কলেরা রোগীর খোঁজ পেলে নিজে সারারাত জেগে সেবা করতেন তার। এখন এই মঠে থেকে সেই সেবা-বোধ যেন তার আরও জাগ্রত হল।

ইউরোপ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে সেখানে ভারতীয় ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দ ফিরলেন। দিকে দিকে মানুষ মালা হাতে বরণ করছেন তাঁকে। গুরুভাইরা সে দৃশ্য দেখে উল্লসিত, উৎফুল্ল। স্বামীজীর কাছে দলে দলে আসতে লাগল নবীন যুববৃন্দ।

এদিকে স্বামীজী আক্রান্ত হলেন বহুমূত্র রোগে। আরোগ্যের আশায় তিনি গেলেন দার্জিলিং। যাবার আগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি মাদ্রাজে পাঠালেন মঠ স্থাপনের জন্য। সহকারী হিসেবে দিলেন আপন শিষ্য স্বামী সদানন্দকে। যাবার দিনেই তাঁকে কুকুরে কামড়াল। অখণ্ডানন্দ তার জন্য ওষুধ আনতে চন্দননগর গেলেন। সেখান থেকে ওষুধ মঠে পাঠিয়ে দিয়ে গঙ্গাতীর ধরে তিনি রওনা হলেন উত্তর মুখে। তাঁর মধ্যে তখন যে নতুন ভাবের দেখা দিল তার হদিশ তিনি নিজেও জানেন না।

পদব্রজে চলেছেন এক সন্ন্যাসী। নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, পলাশী—না, কোথাও বাস করার তাগিদ অনুভব করলেন না অন্তরে। চললেন আরো সামনের দিকে। বেলডাঙ্গায় যখন পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গঙ্গার ধার ধরে চলেছেন হঠাৎ দেখেন একটা বাচ্চা মেয়ে—মুসলমান—গঙ্গার ধারে বসে কাঁদছে। দেখে মনটা তাঁর ভরে উঠল করুণায়। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে মা, কাঁদছ কেন?

কাঁদতে কাঁদতেই মেয়েটি বলে, আমাদের একটা মাত্র কলসী তাই নিয়ে এসেছিলাম খাবার জল আনতে। কিন্তু কলসীটা পড়ে ভেঙ্গে গেছে। এখন আমি বাড়ি ফিরবই বা কেমন করে, আর জলই বা রাখা হবে কোথায়?

মেয়েটির সে জিজ্ঞাসার সমাধান করে দিলেন অখণ্ডানন্দজী। একটা নতুন মাটির কলসী কিনে তাকে দিলেন, আর দিলেন দু পয়সার মুড়িমুড়কি। মুহূর্তে তের চোদ্দটা শীর্ণ ছেলে মেয়ে তাঁকে ঘিরে ধরল। সবার মুখে একটি কথা—বাবা আমাদের খেতে দাও, বাবা আমাদের খাবার দাও। সেই বভুক্ষুর দলকে দেখে অখণ্ডানন্দ বুঝলেন বহুদিন এরা পেটপুরে কিছু খায়নি। বেদনায় তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। সঙ্গে যা পয়সা ছিল তা দিয়ে খাবার কিনে তিনি এদের বিলিয়ে দিলেন। তারপর কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী আবার যাত্রা শুরু করলেন উত্তরে। ভাবতা স্টেশনে রাতটা কাটিয়ে ভোরের ট্রেনে উঠবেন, কিন্তু ওঠা হ'ল না। কি এক ভাবে আচ্ছন্ন হলেন তিনি। সেদিন ছিল অন্নপূর্ণা পূজা। কাছেই এক বাড়িতে হচ্ছিল পূজা। সে বাড়ির লোক অযাচিত ভাবে ডেকে নিয়ে গেল তাঁকে। তিনিও স্নান করে মণ্ডপে বসে শুরু করলেন সুললিত কণ্ঠে চণ্ডী পাঠ। পাঠ শেষে প্রার্থনা করলেন, দেবী, তুমি যদি আমাদের অন্নপূর্ণা মা, তবে আমাদের এত অন্নকষ্ট কেন? কেন, কেন ঘরে ঘরে এত অন্নাভাব? সবার দুঃখ তুমি দূর কর মা।

সেদিনটা সেখানেই কাটল। পরদিন যাত্রা করবেন কিন্তু তখনই তিনি পেলেন ঠাকুরের নির্দেশ—এখানে এই গঙ্গাতীরে তোর অনেক কাজ আছে।

স্বামী অখণ্ডানন্দর যাওয়া আর হ'ল না। থেকে গেলেন সেখানে। দেখলেন দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে অনশনক্লিষ্ট মানুষ দেখে তাঁর নয়নে নেমে এল করুণার বারি। তিনি ঠিক করলেন, এদের দুঃখ দূর করতে না পারলে এদের মুখে অন্ন তুলে হাসি ফোটাতে না পারলে, এদের ত্রানের ব্যবস্থা করতে না পারলে—বৃথা—বৃথা সব কিছু।

অস্থির অখণ্ডানন্দ সবকিছু জানিয়ে চিঠি লিখলেন মঠে। স্বামীজী যখন এই চিঠি পেলেন তখন দুঃখে বিগলিত হ'ল তাঁরও হৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে পাঠিয়ে

দিলেন দুজন গুরু ভাইকে। সে দিনটা ১৮৯৭ সালের ১৫ মে। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে প্রথম ত্রাণ কাজটি শুরু হ'ল 'বহরমপুরের পাঁচগাঁ এবং মাহুলা অঞ্চলে, মন প্রাণ দিয়ে ত্রাণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। আর অর্থ দিয়ে, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়ে, কর্মী দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ আর স্বামী প্রেমানন্দ। সেদিনের সেই সেবা কার্য চলেছিল প্রায় একবছর। মানুষ অবাক হয়ে দেখল ভারতের সন্ন্যাসী শুধু জপ ধ্যানে আর মুক্তির তপস্যায় দিন কাটায় না—আর্তের ত্রাণেও ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁরা। মানুষের কাছে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য দেখে বিস্মিত হ'লেন জেলাশাসক মিঃ লেভিঞ্জ।

দুর্ভিক্ষের ফলে বহু শিশুর বাবা মা হয় মারা গেছে বা সঙ্গচ্যুত হয়েছে। তারা তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অনাথের মত। তাদের দেখে লেভিঞ্জ স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে বললেন স্বামীজী আমি এই প্রথম দেখলাম হিন্দুসন্ন্যাসী ত্রাণ কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। দুর্ভিক্ষতো শেষ হয়েছে এখন অনাথ শিশুগুলির ভার নিন আপনি। আপনি যদি একটি অনাথ আশ্রম খোলেন তবেই হবে দেশের প্রকৃত উপকার।

লেভিঞ্জের সে কথা শুনে অখণ্ডানন্দ সব জানলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। সমর্থন পাওয়া গেল তাঁর। স্থাপিত হ'ল অনাথ আশ্রম। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবাই পেল তাতে ঠাঁই। আশ্রম প্রথমে মাহুলায় পরে শিবনগরে একটা পুরানো দোতলা বাড়িতে উঠে আসে। ১৮৯৮ সালে স্থাপিত অনাথ আশ্রমটির নাম হয় রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম। আশ্রমের সেইসব অনাথ শিশুর খাওয়া, দাওয়া, লেখাপড়া শেখানো, সেবাশুশ্রূষা করা এবং কর্ম শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করা সব কাজ তখন একা করতে হ'ত স্বামী অখণ্ডানন্দকে। সবার কাছে তখন তাঁর পরিচিত 'দণ্ডীঠাকুর' হিসেবে। ১৩ বছর বাদে আশ্রমটি সারগাছিতে তার নিজস্ব ভবনে উঠে যায়।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে এই সালে ত্রাণ কাজ সম্পর্কে স্বামীজী পরে অখণ্ডানন্দকে বলেছিলেন, 'যখন প্রেমানন্দ স্বামী তোমার চিঠি গুলি আমাকে দিল তখন দেখলাম ঠাকুর মাহুলাতে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তোমার সেবাকার্য এত সফল।'

যাই হোক রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমের ছেলেদের লেখাপড়ার সঙ্গে স্বনির্ভর করার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। ১৯০৫ সালের অনেক আগে থেকেই তিনি এখানে চরকা এবং তাঁত চালিয়েছেন। গান্ধীজীর চরকা কাটার অনেক আগেই চরকায় কাপড় বুনে তা পরে অখণ্ডানন্দ বলেছিলেন, 'আমি একজন সামান্য সন্ন্যাসী।

এই নগণ্য পল্লীতে এই চার আঙুল কাপড় বুনেছি। এর দ্বারা তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর নগ্নতা কিঞ্চিত ঢাকতে পেরেছি।'

অখণ্ডানন্দ তাঁর একক প্রচেষ্টায় এই সারগাছি আশ্রমটি গড়ে তোলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে এবং আশ্রমের উদ্যোগে গ্রামের বালক এবং বয়স্কদের জন্য দু'টি বিদ্যালয় পরিচালিত হতে থাকে। এই সঙ্গে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলেন তিনি। গ্রামের লোকেদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত পাঠ, ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল।

পূর্ববঙ্গে যেবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় সেবার অখণ্ডানন্দজীও কিছু করতে না পেরে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মতই শাক পাতা সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাতেন, প্রার্থনা করতেন দুর্ভিক্ষ অবসানের।

১৯৩৪ সালে বিহারে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জেলা পরিদর্শণ করে তিনি সেখানে ত্রান কাজের ব্যবস্থা করেন। তখন তার ৭০ বছর বয়েস। অথচ ওই বয়সে তার নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন যে সেবাকাজ চালায় তা দেখে মুগ্ধ হন মহাত্মা গান্ধী এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ। তার তৎপরতা দেখেই তাঁদের মনে মিশন সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়ে ওঠে।

আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের সঙ্গে মানুষের সেবা করে গেছেন তিনি আজীবন। শিবজ্ঞানে জীবসেবার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি। ওই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। তাই কংগ্রেসের কর্মধারা দেখে চিত্তরঞ্জন দাসকে ১৮ পাতার এক চিঠি লিখে তিনি বলেন, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন গ্রামে হওয়া উচিত, কংগ্রেস সভাপতির মোটরে না গিয়ে গরুর গাড়িতে সভাস্থলে যাওয়া উচিত, কংগ্রেস আগত প্রতিনিধিদের গ্রামবাসীদের খাবার খাওয়া উচিত। আরেকবার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বলেন "আপনারা কিভাবে কংগ্রেস পরিচালনা করছেন? দেশের মঙ্গল চাইলে গ্রামে যেতে হয়। সেখানে হাজার হাজার গ্রামবাসী রয়েছে, যারা আপনাদের কোন কথাই জানেনা। আপনারা এখন শুধু শহরে বসে কংগ্রেস করছেন। আপনারা গ্রামে গিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন করেন না কেন?" আবার একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলেন, "আপনি এখানে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন করেন না কেন? এই সংস্কৃতই তো জাতির মেরুদণ্ড।"

একই সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য দূর করার, তাদের সেবা করার, তাদের রাজনৈতিক মুক্তির সঠিক পথ অনুসন্ধান এবং তাদের প্রকৃত শিক্ষার পথ নির্দেশ কাজে ব্রতী ছিলেন

তিনি। ১৯২৫ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইসপ্রেসিডেন্ট এবং ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে স্বামী শিবানন্দের মহাপ্রয়াণের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু তখনও তিনি সারগাছি আশ্রম ছেড়ে বেলুড়ে গিয়ে থাকতে চান নি। কাজে, ন্য সেখানে থাকতে হলেও কাজ মিটলেই চলে আসতেন সারগাছিতে। সেখানকার অনাথ শিশুদের চিন্তায় প্রাণ কাঁদত তাঁর।

বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত অখণ্ডানন্দ বেদান্তচর্চাতেও ছিলেন আগ্রহী। রাজপুতনায় থাকার সময় আয়ত্ত করেন হিন্দী ব্যাকরণও। উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'তিব্বতে তিন বৎসর' বা বসুমতীতে প্রকাশিত অসমাপ্ত রচনা 'স্মৃতি-কথা' বাংলাসাহিত্যের সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে ভাবিত, বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথের পথিক স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৯৩৭ সালের ৭ মার্চ ফিরে যান ইষ্ট দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের কোলে। দেশ জুড়ে সেসময় চলছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিক উৎসব।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

তত্ত্বং দেব ন জানামি রামকৃষ্ণ তব প্রভো।
যাদৃশোঽসি কৃপাসিন্ধো তাদৃশায় নমো নমঃ॥

বেশ কিছুদিন বাদে হরিপ্রসন্ন এবার এল দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বারবার তাঁকে খবর পাঠিয়েছেন তবু আসার গরজ ছিল না। তারপর শরৎ যখন তাকে গিয়ে বলল, কিরে, দক্ষিণেশ্বরে যাসনি কেন, ঠাকুর তোকে ডেকেছেন। তখন আর না এসে পারল না হরিপ্রসন্ন। তাকে দেখেই ঠাকুর বেশ সখেদে বললেন, কি রে এতদিন আসিস নি কেন? এত করে ডেকে পাঠাচ্ছি তোকে, অথচ তোর আসবারই নাম নেই।

কি করব, সব সময় আসার প্রেরণা পাই না যে মনে। হরিপ্রসন্নর স্পষ্ট জবাব।

সেই সহজ সরল কথাটা শুনে ঠাকুর শুধু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, না আসিস না এলি, কিন্তু একটু একটু ধ্যান করছিস তো?

করছি কিন্তু ধ্যান তেমন জমছে না। আচ্ছা ভালভাবে ধ্যান কেমন করে করা যায় আমায় একটু শিখিয়ে দেবেন! সবাই যে বলে ধ্যানানন্দে ডুবে থাকা যায়। কই আমার তো তেমন হচ্ছে না?

হরিপ্রসন্নর কথা শুনে আবারও হাসলেন ঠাকুর। তারপর বললেন, ধ্যানে ডুবে যেতে চাস, আনন্দ পেতে চাস?

চাই-ই তো।

তবে আয়, কাছে আয়। ঠাকুর ডাকেন হরিপ্রসন্নকে। কাছে আসে হরিপ্রসন্ন। ঠাকুর বলেন, এবার, বের কর তোর জিব। তর্জনী দিয়ে জিবের ওপর লিখে দেন কি একটা মন্ত্র। তারপর বলেন এবার যা পঞ্চবটিতে গিয়ে ধ্যানে বোস।

হরিপ্রসন্নর তখন একটা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা। আচ্ছন্নের মত ধীরে ধীরে তিনি যান পঞ্চবটিতে। বসেন ধ্যানে। আশ্চর্য। সেদিন ধ্যানে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হন সমাধিস্থ। মন চলে যায় এক আনন্দলোকে।

অনেকক্ষণ বাদে ধ্যান যখন ভাঙে তাঁর, তখন দেখেন ঠাকুর তাঁর বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। হরিপ্রসন্নকে তিনি বলেন, কিরে আজ ধ্যান হয়েছে।

হ্যাঁ বড় আনন্দ পেলুম আজ। আজ আমার সত্যিকারের ধ্যান হয়েছে। আবেগ-ভরা গলায় বলে যায় হরিপ্রসন্ন।

হবে রে হবে, এবার থেকে দেখিস রোজ হবে।

ঠাকুরের সে কথা শুনে হরিপ্রসন্ন লুটিয়ে পড়েন তাঁর পায়ে। তিনি তুলে নেন তাঁকে বুকে। এক আনন্দ মহাসাগরের বুকে মিশে যায় আনন্দসাগর।

হরিপ্রসন্নের মনে পড়ে প্রথম যেদিন ঠাকুরকে দেখেছিলেন তখন তিনি নেহাতই কিশোর। বেলঘরিয়ার দেওয়ান গোবিন্দ মুখুজ্জের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। গৃহীভক্ত গোবিন্দ দেওয়ানের বাড়িতে প্রায়ই পড়ে ঠাকুরের পায়ের ধুলো। যেদিন ঠাকুর আসেন সেদিনই মুখুজ্জের বাড়িতে যেন বসে আনন্দের হাট। পাড়ার বহু মানুষ ভিড় করেন তাঁর বাড়িতে সেদিনও তাই হয়েছিল। ভিড়ের এক কোন দাঁড়িয়ে ছিলেন কিশোর হরিপ্রসন্ন। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে তাঁর জেগেছিল বিস্ময়। বারবারই মনে হয়েছিল, এ কেমন সাধু? গেরুয়া নেই, মাথায় জটা নেই, কপালে ভস্ম নেই—এ আবার কেমন সাধু?

উনি যে কেমন সাধু হরিপ্রসন্ন আজ বুঝলেন তা ভাল ভাবেই। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনের মধ্যে কেটে যায় দু'টি বছর। হরিপ্রসন্ন তাঁকে দেখার, কাছে যাওয়ার কোন তাগিদই অনুভব করেন না। দেখতে দেখতে এল ১৮৮৩ সাল। হরিপ্রসন্ন তখন কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। সহপাঠীদের মধ্যে আছেন পরবর্তীকালের স্বামী সারদানন্দ—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, বিখ্যাত সংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বরদা পাল প্রভৃতি। এই সময়ই একদিন (সম্ভবত ১৮ নবেম্বর) শরৎ আর বরদার সঙ্গে হরিপ্রসন্ন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন ঠাকুরের মুখে নানা তত্ত্বকথা শুনে আবিষ্ট হলেন তিনি। সেদিন সন্ধ্যাতেই কলকাতাতে মনি মল্লিকের বাগানবাড়িতে ঠাকুরের যাওয়ার কথা ছিল। তাই বেশি কথা হ'ল না। শুধু বললেন, তিনি তাঁর এই তিন বালকভক্তকে, যাবি আমার সঙ্গে কলকাতায়? এককথায় রাজি হলেন তাঁরা। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁরাও গেলেন সেদিন মণি মাল্লিকের বাড়ি। নানা কথার মধ্য দিয়ে কেটে যায় সময়, মন ভরে যায় হরিপ্রসন্নর। একটা আনন্দ নিয়েই বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি বেশ রাত করেই।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন উৎকণ্ঠিতা মা। ছেলেকে দেখেই জিজ্ঞেস করেন, কি রে আজ ফিরতে এত রাত হ'ল? আমি তো ভেবে ভেবে মরি।

ভাবনার কি আছে। দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে।

ও, তুই সেই পাগলা বামুনটার কাছে গিয়েছিলি ?

উনি পাগল। একথা তোমায় কে বলল। আমি তো ওর মধ্যে পাগলামোর চিহ্ন মাত্র দেখতে পেলাম না। দিব্য সহজ সরল মানুষ। আর কী সুন্দর জ্ঞানের কথা বলেন—সব কিছু জলভাতের মত মনে হয়।

কি জানি বাপু। শুনেছি উনি কম করে সাড়ে তিনশ কাঁচা ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছেন।

কি যে সব উদ্ভট কথা বল না মা। বলেই হরিপ্রসন্ন বলে যান ভিতরে।

মাকে ও কথা বললেও সত্যি সত্যিই সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তরুণ হরিপ্রসন্নর অন্তর্জগতে তুলেছিলেন এক বিরাট আলোড়ন। সর্বকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে সারাক্ষণের জন্য তার পায়ের তলায় বসে থাকার জন্য মনটা তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সে সময়কার মানসিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, "সত্যি মাথাটা খারাপ করে দিয়েছিলেন তিনি মাথাটা আমার খারাপ হয়ে গেছে। যদি না আমি দক্ষিণেশ্বরের সেই উন্মাদের প্রভাবের আওতার মধ্যে আসতাম।—ভগবান জানেন, আর আমি কোথায় থাকতাম। হয়তো এই পার্থিব সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকতাম এবং আর পাঁচজন যে ভাবে জীবন কাটায় আমিও ঠিক সেই গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটাতাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যিনি 'বিব. সন্ন্যাস' বা বিজ্ঞান মহারাজ নামে পরিচিত, বিবেকানন্দ যাঁকে আদর করে কখন 'পেসন' কখনও 'এলাহাবাদের বিশপ' বলে ডাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত সন্তানদের মধ্যে কনিষ্ঠতম সেই হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সন্ন্যাস নিয়ে হয়েছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে শেষ অধ্যক্ষ।

১৮৬৮ সালের ২৮ অক্টোবর (নাকি ৩০ অক্টোবর ?) বেলঘরিয়ায় এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুল প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফার্স্ট আর্টস বা এফ. এ. পড়েন সেন্ট জেভিয়ার্সে এবং পরীক্ষায় একুশতম স্থানটি দখল করেন। বি.এ. পাশ করেন পাটনা কলেজ থেকে এবং পুণে কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ১৮৯২ সালে দ্বিতীয় হয়ে এল. সি. ই. পরীক্ষা পাশ করেন।

ভারত সরকারের অধীনে ডিস্ট্রিকট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রায় পাঁচ বছর গাজীপুর, এটোয়া, মীরাট, বুলন্দশহর প্রভৃতি জায়গায় কাজ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য

ঁজয়ের পর ফিরে এলে ১৮৯৬ সালে আলমবাজারে রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দেন এবং ন্ন্যাস নেন ১৮৯৮ সালে।

বিজ্ঞানস্বামী ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক, সত্যবাদী এবং মাতৃভক্ত। মা'র জন্যই আগে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে মঠে যোগ দেন সবার শেষে।

হরিপ্রসন্নের বয়েস তখন তের বছর। একটা ব্যাপার নিয়ে মা তাঁকে বলেন মিথ্যেবাদী। হরিপ্রসন্ন বারবারই বলতে থাকেন মিথ্যে কথা তিনি বলেন না, লছেনও না। মা তবু বিশ্বাস করেন না। তখন রেগে হরিপ্রসন্ন নিজের পৈতে ছিঁড়ে লেন, আমি যদি মিথ্যে কথা বলি তবে আমি ব্রাহ্মণই নয়। মা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, হায়, হায়, কি সর্বনেশে ছেলেরে তুই। পৈতে ছিঁড়ে বসলি না জানি কি অমঙ্গল ঘটে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারপরদিনই কোয়েটা থেকে খবর আসে, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে হরিপ্রসন্নের বাবা নিহত হয়েছেন। সে তারবার্তা পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে মা বলেছিলেন, দেখ তোর অভিশাপে আজ কি সর্বনাশটা হ'ল।

এরপর থেকে মা'র প্রতি কর্তব্যের টানটা বেশি করে অনুভব করতে থাকেন তিনি। তাই এল সি ই পাশ করে সরকারি চাকরি নেন। বেশ কিছুদিন চাকরি করার পর টাকা পয়সা জমিয়ে যখন দেখলেন সেই টাকায় মা'র বাকি জীবন বেশ ভালভাবেই কেটে যাবে তখনই তিনি মঠে এসে যোগ দেন।

হরিপ্রসন্নের সত্যের প্রতি এই নিষ্ঠা ছিল আজীবন। সত্য কথা বলতে যেমন ভয় পেতেন না, তেমনি কেউ অন্যায় ভাবে মিথ্যা কটূক্তি করলে নিজের স্বার্থের কথা না ভেবেই বলিষ্ঠ ভাবে করতেন তার প্রতিবাদ। তাঁর ছাত্র জীবনেই ঘটেছিল এমনি একটি ঘটনা। সেদিন যদি তিনি এর প্রতিবাদ না করতেন তাহলে হয়ত এল সি ই পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি আসত তাঁরই দখলে।

ঘটনাটা ছিল এই রকম। পুণে কলেজে তখন তাঁদের ভূতত্ত্ব পড়াতেন এক পাদ্রী অধ্যাপক। একদিন ক্লাসে তিনি পড়াচ্ছেন। বাইরে কলেজের মাঠে তখন একটি গরু চরছে। দেখে পাদ্রীটির একটু সস্তা রসিকতা করার লোভ হ'ল। ছাত্রদের তিনি বললেন, দেখ—দেখ ওই তোমাদের পিতামহ ঘাস খাচ্ছে।

হিন্দুরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাদের সেই বিশ্বাসকে আঘাত দেবার জন্যই পাদ্রী অধ্যাপকের এই অপচেষ্টা। ছাত্ররা মনে মনে আহত হলেও পরীক্ষায় খারাপ নম্বর পাবার ভয়ে চুপচাপ থাকে। কিন্তু হরিপ্রসন্ন মুখ বুজে মিথ্যাকে সহ্য করার ছেলে নন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন স্যর, যীশুখৃষ্ট তো অনূঢ়া নারীর সন্তান আপনারা তাঁকে ঈশ্বর রূপে পূজাও করেন। এর পেছনে কি কোন যুক্তি আছে।

হরিপ্রসন্নের এই কথাটা শুনে শিক্ষকের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখে'র ম জবাব পেয়ে তিনি আর কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু মনের সেই ঝাল মেটা পরীক্ষার খাতায়। হরিপ্রসন্ন ভূতত্ত্বে তেমন ভাল নম্বর পান না।

যাই হোক সেই কিশোর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়ার পর থেকে আ আট দশ বার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। সম্ভবত ১৮৮৫ সালে ঠা তর্জনি দিয়ে হরিপ্রসন্নের জিভে মন্ত্র লিখে দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চা করেন।

ওই বছরের গোড়ার দিকেই হরিপ্রসন্ন প্রথম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে রা বাস করেন। ঠাকুর তাঁর অন্যান্য ভক্তদের ক্ষেত্রে যা করেছেন হরিপ্রসন্নেরও ঘটে তাই। সেদিন হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে আসার পরই ঠাকুর বলেন, আজ রা এখানেই মা'র প্রসাদ পাবি আর এখানেই রাতে থাকবি। এই অযাচিত সৌভাগে হরিপ্রসন্ন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মনে মনে। এক কথাতেই রাজী হয়ে যান সেদিন যথা সময়ে মন্দিরের প্রসাদ এল। হরিপ্রসন্নকে তিনি আদর করে খেতে বসালেন। হরিপ্রসন্নের বয়সের চেয়ে তখন অনেক ভাল চেহারা। যেমন লম্বা তেমনি প্রস্থে অনেক খানি। তাকে খেতে দিয়েই ঠাকুরের মনে হ'ল এতটুকু প্রসাদে তার এই কনিষ্ঠ সন্তানটির খিদে মিটবে না, তাই তিনি খবর পাঠালেন নহবতখানা শ্রীমা'র কাছে। সেখান থেকে এল ডাল আর রুটি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলে হরিপ্রসন্ন। সে রাত্রে ঘরেই মাদুর পেতে নিজের হাতে মশারি গুঁজে শুতে দিলেন তিনি তাঁর এই তরুণ ভক্তকে। তারপর বললেন, "জানিস, কে তোকে এত ভালবাসি? মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তুই এখানকার, তু আমার চিহ্নিত সন্তান।" তারপর আপনমনে ঠাকুর বলে চলেন কত কি কথা হরিপ্রসন্নের কানে কিন্তু সে সব ঢুকছে না। ঘুমে দু চোখ তার ভারি হয়ে আসে তারি মধ্যে হরিপ্রসন্ন দেখলেন, ঠাকুর তার মশারির চারধারে ঘুরছেন আর হাত তালি দিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলছেন। তারও পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দে ভাষায় 'সে রাতে তাঁকে ঠাকুরের যা দেওয়ার ছিল তার সবই উজাড় করে দেন। ওই সময়ই ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, খুব ধ্যান করবি আর খবরদার বিয়ে করিস না মেয়েদের থেকে সব সময় দূরে থাকবি। সব মেয়েকেই মনে করবি মা।'

১৮৮৬ সালের মে জুন নাগাদ ঠাকুরের সঙ্গে হরিপ্রসন্নের স্থূলে শেষ সাক্ষাৎকার কাশীপুর উদ্যান বাটি থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তখন চলে যান পাটনায় বি.এ পড়তে আর ওই বছরেরই আগস্ট মাসে ঠাকুর হন মহাসমাধিমগ্ন। কিন্তু তাঁর হরিপ্রসন্নে

সঙ্গে যোগাযোগ কিন্তু বন্ধ হয় না। বরং প্রায়ই হরিপ্রসন্নের হতো স্বপ্নদর্শন। এটোয়াতে চাকরি করার সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ পরপর দু'বার তাঁকে দর্শন দিয়ে সংসার ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশেই হরিপ্রসন্ন ১৮৯৭ সালে যোগ দেন মঠে।

ঠাকুর তার এই কনিষ্ঠ সন্তানটির প্রতি যে কতটা স্নেহপরায়ণ ছিলেন তা জানা যায় আরেকটি ঘটনা থেকে। সেদিনও ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন হরিপ্রসন্ন। ঠাকুরের কাছে তখন রয়েছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দও। একথা সে কথার পর ঠাকুর হঠাৎ হরিপ্রসন্নকে বলেন, হ্যা রে তোর নাকি খুব শক্তি হয়েছে। দেখি তোর কেমন শক্তি ? আয় আমার সঙ্গে কুস্তি লড়বি আয়। ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়া ? হরিপ্রসন্ন প্রথমটায় একটু ইতস্ততঃ করেন। তারপর যখন দেখলেন ঠাকুর তার সঙ্গে কুস্তি না লড়ে ছাড়বেন না তখন তিনিও নেমে পড়লেন তাল ঠুকতে। হরিপ্রসন্নের দশাসই চেহারা আর ঠাকুরের এতটুকু হাল্কা শরীর। মুহূর্তে হরিপ্রসন্ন ঠাকুরকে শুইয়ে চিৎ করে দেন। সে দৃশ্য দেখে তখন সবার কি হাসি।

হরিপ্রসন্ন কিন্তু তখন অন্তরে অনুভব করছেন এক বিমল আনন্দ। ঠাকুরকে হারাবার জন্য নয়, তার স্পর্শেই খুলে গেছে হরিপ্রসন্নের হৃদয়ে আনন্দের রুদ্ধ দ্বারখানি। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পরবর্তীকালে বলেছেন, "ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একদিন আমি ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়েছিলুম। এই বারান্দার কোলেই গঙ্গা। তিনি ছোটো-খাটো মানুষ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আমি যেমন বড় ছিলাম তেমন গায়েও শক্তি ছিল। আমি সহজেই তাকে চিৎ করে ফেলেছিলাম। কী হাল্কা আর নরম তার শরীর একেবারে তুলোর মতো নরম। মল্লযুদ্ধে আমি জয়ী হয়েছিলাম বটে, কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শের ফলে আমার মধ্যে যে দিব্যশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তখন তাতে আমি রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম।"

চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে হরিপ্রসন্ন মঠে যখন যোগ দেন তখন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে এসেছেন পাশ্চাত্য জয় করে। হরিপ্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল লেগে গেল স্বামীজীর। রাজপুতানা এবং অন্যান্য অঞ্চল সফর করার সময় সঙ্গী হিসেবে তিনি বেছে নিলেন তাকেই। ১৮৯৯ সাল। বেলুড় মঠ আলমবাজার থেকে স্থায়ীভাবে উঠে এসেছে বেলুড়ে। শুরু হয়েছে মঠের বাড়ি-ঘর তৈরি। সে সময় বিজ্ঞানানন্দ ছাড়া মঠ ও মিশনের আর কারো স্থপতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান ছিল না। স্বভাবতই এসব তত্ত্বাবধানের ভার পড়ল বিজ্ঞানানন্দের ওপর। আর তিনিও এই কাজের মধ্যেই পেতে থাকলেন তার প্রভু—তাঁর ঈশ্বরকে সেবা করার আনন্দ।

বেলুড় মঠটি একবারে গঙ্গার পাড়ে। তাই গঙ্গার ভাঙন থেকে মঠটিকে রক্ষা করার জন্য পাকা বাঁধ দেবার দরকার পড়ল। একাজের দায়িত্বও নিলেন তিনি। আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর ছিল পুঁথিগত এবং ব্যবহারিক দক্ষতা। সে দক্ষতার প্রকাশ পেয়েছে যেমন তাঁর নির্দেশনায় তৈরি মঠ ও মিশনের বিভিন্ন ভবনের নকশায় তেমনি তার সে জ্ঞানকে তিনি প্রকাশ করেছেন নানা গ্রন্থের মধ্যেও। সেই যুগে তিনি মাতৃভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিংএর দুটি বই লেখেন। বাংলায় লেখা তাঁর এ ম্যানুয়াল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ওয়াটার ওয়ার্কস প্রমাণ করে বাংলাতে কত সুন্দর ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিংএর মত কঠিন বিষয় লেখা যায়। শুধু এই দুটি বই নয়, তিনি সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে 'দেবীভাগবত' জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের দু'টি প্রাচীন বই এবং বরাহমিহিরের 'বৃহজ্জাতক' ও 'সূর্যসিদ্ধান্ত' এর অনুবাদ করেন। শেষদিকে 'রামায়ণ'-এর ইংরেজি অনুবাদেও হাত দিয়েছিলেন। তবে সে অনুবাদ তিনি শেষ করতে পারেননি। 'নারদ পঞ্চরাত্র' বইটির ইংরেজি অনুবাদও তিনি করেন।

স্বামীজীর নিদেশে বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের যে নকশা তৈরি করেন তা স্বামীজীর অনুমোদন লাভ করে এবং ওই নকশা অনুযায়ী মন্দির তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। জীবনের শেষ বর্ষে ওই বিশাল মন্দিরের উদ্বোধন করেন। নিজের হাতে ইষ্টদেবের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন তিনি মনের মাঝে পোষণ করেছিলেন তা পূর্ণ হয় ১৯৩৮ সালে ১৪ জানুয়ারি। এছাড়া কাশীর রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিস' এবং বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির তাঁরই স্থপতিবিদ্যার কুশলতার অপূর্ব পরিচয়।

এই কৃতবিদ্য এবং কর্মযোগী মানুষটিকে স্বামী সারদানন্দ বলতেন কাবুলি আঙুর। বলতেন আঙুরকে যেমন তুলোয় ঢেকে তারপর কাঠের বাক্সে রাখা হয় ঠিক তেমনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কোমল হৃদয়টি ঢাকা ছিল একটা সুকঠিন ব্যক্তিত্বের আবরণে। আপাতকঠোর এই মানুষটিকে দূর থেকে দেখে অনেকে ভয় পেয়েছেন আবার কাছে এসে তাঁর সহৃদয় কোমল ব্যবহারে তারাই হয়েছেন অভিভূত।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কারস। কথাটা তাঁর প্রাণের গভীরে এমন দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেছিল যে বেলুড়মঠে তাঁর গর্ভধারিণী মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে প্রথমে তিনি কিছুতেই রাজি হননি। পরে গুরুভ্রাতাদের অনুরোধে মা'র সঙ্গে দেখা করে গোটা কয়েক কথা বলেন। তাও মা'কে মঠের ভিতরে আসতে দেননি। বাইরে এক কোণে দাঁড়িয়ে বহুদিন বাদে সেদিন হয়েছিল মা-ছেলেতে কথা

লাহাবাদ মঠে যেদিন তাঁর একমাত্র জীবিতা সহোদরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন দিন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলেও রাত্রে তাঁকে মঠে থাকতে দেননি। মেয়েদের থকে দূরে থাকার নীতিতে তিনি এমন বিশ্বাসী ছিলেন যে মঠে তিনি মেথরাণীকে যন্ত ঢুকতে দিতেন না। এমন কি তাঁর শিষ্যাদের বেশিক্ষণ তিনি তাঁর কাছে থাকতে তেন না। জীবনের এই কঠোর পথকে অনুসরণ করার সূত্রেই তিনি হয়েছিলেন কৃত কামজিৎ, বলতে পেরেছিলেন জীবনে কখনও স্বপ্নে তিনি কোন নারী দর্শন করেন । এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন গুরুর যোগ্য শিষ্য।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে জানা ছিল এক কঠিন ব্যাপার। বিভিন্ন বিষয়ে ছিলেন সাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কিন্তু কখনও কোন কারণেই তার আচরণের মধ্য য়ে তার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পেত না। বরং এমন অসংলগ্ন কথাবার্তা তিনি বলতেন যে ঠাং করে কোন মানুষ তাঁর মাথার সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারত। তনি ছিলেন কর্মকুশলী কিন্তু এমন ভাব করতেন যেন জড়—ন্যালাক্ষ্যাপা মানুষ। থাবার্তায় কখনই প্রকাশ পেত না পাণ্ডিত্যের ছোঁয়া। অথচ তাঁর লেখা বই তার াষণাদির মধ্যেই আবার লুকিয়ে তাঁর অনন্ত জ্ঞানের প্রকাশ। গুরুভাইদের মধ্যে তিনি য়সে ছিলেন সবচেয়ে ছোট কিন্তু চারিত্রিক গুণে, পাণ্ডিত্যে এবং অন্যান্য কর্মধারায় ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের এক বিরল প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর স্বাতন্ত্র্য কাশ পেত তার কর্মধারায়—তাঁর চিন্তায়।

মঠে যোগ দেবার কিছুদিন পরেই বিজ্ঞানানন্দকে নিতে হয় পরিব্রাজকের জীবন। থম দিকে তিনি ছিলেন স্বামীজীর সঙ্গী। পরে একাই চলেন তিনি জীবনের এ পথে—তীর্থে তীর্থে। এই তীর্থ পর্যটনের সূত্রে এই শতাব্দীর শুরুতে তিনি উপস্থিত ন এলাহাবাদে। জায়গাটা তার ভাল লেগে যায়। এখানে ছিল তাঁর বেশ কয়েকজন চিকিৎসক বন্ধু। সে যাত্রায় আশ্রয় নিলেন তিনি তাঁদেরই কাছে। এলাহাবাদের রিবেশ –ত্রিবেণী সঙ্গম বিজ্ঞানানন্দের প্রাণে কেন জানিনা এক পুলক—এক শান্তির বাণী য়ে আনে। মনে হয় এলাহাবাদ যেন তাঁর কত আপনার—কত পরিচিত জায়গা।

তাঁর প্রাণের আশাই সম্ভবত তাঁকে এনে দিল এলাহাবাদ বাসের সুযোগ। দ সময় সেখানকার কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ স্থাপন করেছিলেন 'ব্রহ্মবাদিন ক্লাব' নামে কটি সংস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণেরই এক তরুণ ভক্ত ছিলেন এই ক্লাবের প্রাণ। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় স্থাপিত হয়েছিল এটি। কিন্তু ১৯০০ সালে সেই রামকৃষ্ণভক্ত তরুণটি এলাহাবাদের পাট তুলে কলকাতায় চলে যায়। তখন ক্লাবে হ'ত পূজাপাঠ, শাস্ত্র আলোচনা প্রভৃতি। সেই সব আলোচনার ফলে ক্লাব সদস্যদের নৈতিক এবং

আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে ওঠতে থাকে সুন্দরভাবে। কিন্তু হঠাৎ করে রামকৃষ্ণভক্ত সেই তরুণটি চলে যাওয়ায় তারা যেন কেমন অসহায় বোধ করতে থাকেন। কথায় বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। প্রাণে যদি থাকে ঈশ্বর আরাধনার আন্তরিক বাসনা তবে তার সুযোগ করে দেন ঈশ্বর নিজেই। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'লনা।

ব্রহ্মবাদিন ক্লাবের সদস্যরা তাদের সেই অসহায়তার মুহূর্তে খবর পেলেন, শহরে সে সময় রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এক সন্ন্যাসী। তাদের প্রাণ বলে উঠল এই তো পেয়েছি তাঁকে—যাকে খুঁজছিলাম এতদিন। ক্লাবের কর্মকর্তারা গিয়ে হাজির হলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কাছে। তিনি ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আন্তরিকতা, ধর্মের জন্য সত্যিকারের আগ্রহ এবং নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং প্রায় এককথাতেই রাজি হয়ে গেলেন এলাহাবাদে কিছু দিন থাকতে।

এবার ব্রহ্মবাদিন ক্লাব হ'ল স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এলাহাবাদের ঠিকানা। যথারীতি চলত সেখানে পূজো, পাঠ, শাস্ত্র আলোচনা। এই সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ আপন ধারায় চালাতেন তপস্যা—বসতেন সুগভীর ধ্যানে। অল্প কিছুদিনের জন্য থাকতে রাজি হয়ে বিজ্ঞানানন্দ এসেছিলেন ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে। কিন্তু দেখতে দেখতে কেটে গেল আট আটটা বছর। পবিত্র প্রয়াগ তীর্থে তিনি ওড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ নামের পতাকা - পতাকার তলায় আনলেন অসংখ্য মানুষকে আর এলাহাবাদেই প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ মঠের একটি স্থায়ী কেন্দ্র। তার একক চেষ্টায় স্থাপিত সেই কেন্দ্রই হ'ল তাঁর অবশিষ্ট জীবনের স্থায়ী ঠিকানা। সেখান থেকেই বিচ্ছুরিত হতে থাকে তাঁর সাধন জীবনের পুণ্যরাশির পুণ্যচ্ছটা।

১৯১০ সালে বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মবাদিন ক্লাব থেকে চলে আসেন মুঠিগঞ্জে। স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ। "এই দরিদ্র, অজ্ঞ, দুঃস্থ, আর্ত—এরাই তোমাদের ভগবান জেনে রেখো একমাত্র এদের সেবাই হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।" স্বামীজির এই উপদেশ-ঈশ্বর সাধনার এক নির্দেশকে সামনে রেখে বিজ্ঞানানন্দ এই আশ্রমে স্থাপন করেন একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। আর্তের সেবায় কাটত তাঁর দিন আর এই সময় থেকেই ক্রমশ তিনি যেন নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে থাকেন। চিরকালই তিনি ছিলেন নির্জনতা পিয়াসী। কিন্তু এই সময় থেকে যেন বাড়তে থাকে অন্তর্মুখিনতা। এই সময় তিনি সবসময়ই যেন মগ্ন থাকতেন অপার ব্রহ্মানন্দে। তাঁর তখনকার প্রকৃত অবস্থাটি ধরা পড়েছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের চোখে। তাই তিনি বলতেন, "প্রসন্নকে জানা বা বুঝা খুব কঠিন। তিনি সবসময়ই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্। আত্মাকে তিনি জেনেছেন তাই তিনি আত্মারাম।" ঠিক একারণেই যাঁরা স্বামী ব্রহ্মানন্দে

াছে প্রকৃত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নিয়ে আসতেন, আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে যে সব ব্রহ্মচারীর ধ্য দেখা পেতেন প্রচণ্ড আকুলতার, তাদেরই তিনি বেলুড় মঠ থেকে পাঠিয়ে দিতেন লাহাবাদে বিজ্ঞান মহারাজের কাছে। বলতেন, জেনো, প্রকৃত শিক্ষা তোমাদের খানেই হবে, এখানে নয়।

আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, সুপণ্ডিত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বই পড়ার ব্যাপারে ছিলেন বভুক। যে কোন ধরণের বই তিনি পড়তেন আগ্রহ নিয়ে, পড়তেন সমান মনোযোগ যে। তিনি মনে করতেন প্রতিটি বই ই জ্ঞানের খনি। প্রতিটি বই থেকেই পাওয়া য কিছু না—কিছু যা দিয়ে ধীরে ধীরে ভরিয়ে নেওয়া যায় জীবনপাত্রকে। এলাহাবাদের 'জন বিখ্যাত পণ্ডিত নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র দাস এবং মেজর বি ডি বসু। এঁদের উৎসাহ ও আগ্রহই তাঁকে প্রবৃত্ত করে সাহিত্য সাধনায়।

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের হাপ্রয়াণের পর মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ হিসবে নির্বাচিত করা হয় স্বামী িজ্ঞানানন্দকে। নির্জনতাপ্রিয় এই সাধকটি প্রথমে এই পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হলেও াবে সবার চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। কিন্তু এলাহাবাদের শান্ত স্নিগ্ধ নির্জন রিবেশ ছেড়ে বেলুড়ে স্থায়ী ভাবে বাস করতে তিনি অস্বীকৃত হন। তাই সংঘাধ্যক্ষ িসেবে যে একটা বছর তিনি জীবিত ছিলেন তার বেশির ভাগ তাঁর কেটেছে এলাহাবাদে।

সংঘ মহানায়ক হিসেবে তাঁর প্রধান কাজ বেলুড় মঠে তাঁরই পরিকল্পিত নকশায় নর্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে তাঁর ইষ্ট দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ মাথায় করে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মঠে আর তার ৪০ বছর বাদে ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর প্রাণের দেবতাকে এই নতুন মন্দিরে। বয়সের ভারে জীর্ণ বিজ্ঞানানন্দের আশঙ্কা ছিল, তাঁর গুরুমূর্তিকে তিনি হয়ত প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারবেন না এই মন্দিরে। কিন্তু সেই শুভ মুহূর্তটি তাঁর জীবনে দেখা দেওয়ার পর তিনি হন অভিভূত। সেদিন তিনি তাঁর সর্বস্ব নিবেদন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে দেবমূর্তি। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন ৫০ হাজার মানুষ।

এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর মঠের কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সেরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আবার ফিরে যান এলাহাবাদে। সেখানে রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের কাজ দ্রুত সারার দিকে মন দেন তিনি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মনে মনে অনুভব করেছিলেন, এখানে তাঁর কাজের সময় এসেছে

ফুরিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান তিনি আবার ফিরে যাবেন তাঁরই কাছে—লীন থাকবেন পরম আনান্দসাগরে। মনে করলেন, জীবনের পরম পবিত্র কাজটি তিনি সেরে যেতে পেরেছেন—তাঁর হৃদয় দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পেরেছেন মন্দিরে এবার তাঁর ছুটি, বিদায় নেবার পালা।

এরই মধ্যে একবার আবার তাঁকে আসতে হ'ল বেলুড়ে মঠের কাজে। সেবার অনেকে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষালাভ করে তাঁর উপদেশ শুনে নিজেদের জীবনকে মনে করলেন ধন্য। মঠের প্রধান সন্ন্যাসীদের সেবার স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যেন তাঁর যাবার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। এলাহাবাদে ফেরার আগে লুটিয়ে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে। বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় থেকে অনুভব করলেন হৃদয়ে তাঁর উপস্থিতি। তারপর ধীরে ধীরে মঠ ছেড়ে তিনি যাত্রা করলেন এলাহাবাদের পথে।

১৯৩৮ সালের ২৫ এপ্রিল তিনি লাভ করলেন মহাসমাধি। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী—যে এলাহাবাদে তিনি তাঁর চল্লিশ বছরের সন্ন্যাসী জীবনের প্রায় ৩৭ বছর অধ্যয়ন, তপস্যা, গ্রন্থ রচনা ও নিষ্কাম কর্মে কাটিয়ে দিয়েছেন—সেখানেই পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁকে দেওয়া হয় জলসমাধি।

স্বামী শুদ্ধানন্দ

বন্দে জগদ্বীজমখণ্ডমেকং, বন্দে সুরাসেবিত পাদপীঠং।
বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং, তমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণং॥

আচ্ছা মশাই, আপনি সব ছেড়ে গেরুয়া পরলেন কেন ?

সকলকেই তো এই জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। গৃহে থাকলে ওপারের ডাক শুনে যেতে বড় কষ্ট হয়। তাই সব ছেড়ে গেরুয়া পরে এখন থেকেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছি যাবার জন্য।

অমন একটা প্রশ্নের এমন সোজা সরল উত্তর যিনি দিয়েছিলেন তাঁর নাম স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিবেকানন্দ তাঁকে ডাকতেন খোকা বলে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের পর তিনি হন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি।

গুরুগতপ্রাণ স্বামী শুদ্ধানন্দের বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি। সাদাসিধে কথায় কঠিন বিষয়েরও সমাধান করা। এ কারণেই একদিন যখন তাঁর পূর্বাশ্রমের ঘনিষ্ঠ পরিচিত এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, হ্যাঁ হে সুধীর, উঁচু বামুনের ঘরে জন্মে তুমি কিনা শেষে এক কায়েতকে গুরু করলে ? তখন তিনি উত্তেজিত হ'ননি এতটুকু। বরং সজল চোখে বলেছিলেন, কায়েত্ কি বলছিস ভাই ? আমি শুধু এই কথাই ভাবছি যে, হায় তিনি কেন চাঁড়ালের ঘরে এলেন না।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'গাল বেয়ে নামে জলের ধারা। সে দৃশ্য দেখে প্রশ্নকর্তাই অপ্রস্তুত। মাথা নিচু করে বিদায় নেন তিনি।

স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, "গুরু কাকে বলা যায় ? যিনি তোমার অন্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি দেখতে পান এবং তারা ভূতকালে তোমাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং ভবিষ্যতে কোন্ দিকে চালাবে অর্থাৎ তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন তিনিই তোমার গুরু।"

গুরুর এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন বলেই অসুস্থ

অবস্থাতেও যখন মুমূর্ষু মানুষের প্রাণের তৃষ্ণা দূর করেছেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানবারি সিঞ্চনে তখনও তাঁর মধ্যে এতটুকু দানা বাঁধতে পারেনি গুরুর অভিমান। একদিনের কথা। সংঘগুরুর কৃপাপ্রার্থী বহুদূর থেকে এসেছে এক যুবক। মঠে থেকেই কয়েকদিন ধরে সে নিবেদন করে যাচ্ছে তার প্রাণের আহুতি। সেদিনও সে যখন বসে আছে সেইসময় আসেন নির্মল মহারাজ সংঘের ভাবী গুরু স্বামী মাধবানন্দজী। তিনি এসে স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে প্রণাম করার পরই শুদ্ধানন্দজী বললেন, "দেখ নির্মল, এই ছেলেটি আমার কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে। ভেবেছে—আমি প্রেসিডেণ্ট।—দেখ বাপু, আমার নিজেরই কিছু হ'ল না! তোমরা এখন দীক্ষাদি দাও।"

এই হলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। তিনি ছিলেন পূর্ণ কলসী, তাই ঠন্-ঠন্ আওয়াজ উঠত না তাব থেকে। তাইতো জনৈক তরুণ একদিন তাঁর আত্মচরিত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "স্বামীজী এবং গুরু ভ্রাতাগণের উপদেশ ও স্মৃতিই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।" তিনি বলতেন, "সামান্য ইংরেজি পড়ে আমরা সব বিষয়ে সন্দেহ করতে বিশেষ শিখেছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর বাক্যে আমার কখনই অবিশ্বাস হয়নি। কারণ তাঁর কথা শ্রবণমাত্রই ধ্রুবসত্য দৃঢ় ধারণা হ'ত।"

বেশি কথার কচকচি নয়, সহজ কথায় তিনি ব্যক্ত করতেন আসল কথাটি। তাই এক আত্মজিজ্ঞাসুকে তিনি লিখেছিলেন, "সাধনা জিনিসটাই হচ্ছে মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির সঙ্গে এনভায়রমেণ্টের স্ট্রাগল। সুতরাং উন্নতি করিবার দুইটি উপায় আছে। এক বলপূর্বক এনভায়রমেণ্ট ছাড়াইয়া নূতন অনুকূল এনভায়রমেণ্টে আপনাকে উপস্থাপিত করা, অথবা ওই এনভায়রমেণ্টের ভিতর থাকিয়াই যথাসাধ্য উহার সহিত স্ট্রাগল করিয়া আভ্যন্তরীণ বলবীর্য সংগ্রহ করা। নতুবা যদি এনভায়রমেণ্টে গা ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্য।"

এ শুধু তাঁর কথার কথা নয়, অথবা আপ্তকাম হবার পরই তিনি একথা বলেননি, এভাব ছিল তাঁর আজন্ম লালিত। একদিকে একটু বেপরোয়া অন্যদিকে গড্ডালিকা-প্রবাহে গা না ভাসিয়ে এনভায়রমেণ্টের বাইরে সংস্থাপিত করার এক তীব্র বাসনা ও চেষ্টা ছিল তাঁর চিরসঙ্গী।

মনে পড়ে সে দিনটার কথা। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মঠে গিয়েছেন তিনি সবে। পাশ্চাত্য বিজয় শেষে প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ তখন যেন এক জলন্ত পাবক। তাঁর সামনে থেকে তাঁর তেজ সহ্য করা তখন রীতিমত এক কঠিন ব্যাপার। ১৮৯৭ সালের এপ্রিলের শেষ তখন। ঠিক সেই সময়ে এক বিকেলে

আলমবাজার মঠের বড় হলঘরটাতে সমবেত সাধু ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হ'ল ক'টি শব্দ—"একজন কেউ লিখতে থাক আমি বলি।"

স্বামী নিত্যানন্দের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আদর্শ, কর্মনীতি এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের জীবনধারা সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য স্বামীজী উচ্চারণ করলেন ঐ ক'টি কথা।

সেদিন সেই বহ্নিমান ব্যক্তিত্বের সামনে বসে লেখার মত সাহস করতে পারছিলেন না কেউ। একে অপরকে ঠেলতেন লেখার জন্য। স্বামীজীর মুখ বুঝি হয় গম্ভীর। এমন সময় এগিয়ে গেলেন স্বামীজীর অনির্দিষ্ট 'একজন কেউ'। বয়সে নবীন, মঠেও যোগ দিয়েছে সবে চার-পাঁচদিন—সেই এগিয়ে গেল কাগজ কলম নিয়ে স্বামীজীর মুখনিঃসৃত বাণী ধরে রাখার জন্য। সেদিনের সেই নবীন মঠবাসী হলেন সুধীর মহারাজ বা স্বামী শুদ্ধানন্দ।

স্বামীজী বলে যেতে লাগলেন—কখনও দ্রুত—কখনও বা চিন্তার জন্য সামান্য বিরতি। কিন্তু একাগ্র মনে স্বামীজীর প্রতিটি কথাকে হুবহু কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে ধরে রাখলেন সেদিনের সুধীর ব্রহ্মচারী।

স্বামীজীর নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দজী বলেছিলেন, "এখন অনেক নতুন নতুন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।" তাঁর সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেই স্বামীজী প্রণয়ন করলেন ওইসব নীতি। কিন্তু তার আগে তিনি বলেন, "দেখ এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করবার মানে এই যে আমাদের স্বভাবতঃই কুনিয়ম রয়েছে—সুনিয়মের দ্বারা সেই কুনিয়মকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে, শেষে দু'টো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।"

নিয়মগুলো সব বলা হয়ে যাবার পর স্বামীজী বললেন, সেদিনের সুধীরকে, "দেখ্ একটু দেখেশুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ্—দেখিস্ যদি কোন নিয়মটা নেগেটিভ লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে পজেটিভ করে দিবি।" স্বামীজী প্রণীত এবং সুধীর মহারাজ কর্তৃক শ্রুতলিখিত এই নিয়মগুলিই পরে 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী'-তে রূপান্তরিত হয়।

কিছুটা 'বেপরোয়া ও ফরোয়ার্ড' বলেই সুধীর হয়ত পেরেছিলেন স্বামীজীর বেশি কাছাকাছি আসার। ১৮৯৭ থেকে ১৯০২—এই পাঁচ বছরের মধ্যেই

সুধীরকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন স্বামীজী। এটা সম্ভব হয়েছিল দাতা ও গ্রহীতা—দুয়েরি প্রাণের ঐকান্তিকতা, শ্রদ্ধা এবং ধৈর্য্যের জন্য। স্বামীজী যেমন ছিলেন দেবার জন্য প্রস্তুত, শুদ্ধানন্দ তেমনি সবসময় নিজেকে তৈরি রেখেছিলেন সেই করুণাধারায় জীবনপাত্রকে ভরে নেবার জন্য।

মঠের বড় হলঘরেই তখন বসত নবীন সন্ন্যাসীদের শিক্ষা দেবার আসর, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের মীমাংসা, সাধুসন্ত সম্মিলন সবই হত ওই ঘরে। সেদিনও স্বামীজীকে কেন্দ্র করে বসেছে সাধু-ভক্তদের সম্মেলন, নানা বিষয়ে আলোচনা চলছে। তারই মধ্যে স্বামীজী নবীন ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দকে বললেন আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী বিশেষ করে স্বামীজীর সামনে বলার জন্য শুদ্ধা-নন্দের হৃদয় এতটুকু কাঁপল না। কেননা, তিনি জানতেন, গুরু যখন বলতে বলেছেন, তখন যা বলার—যা বলাবার তা তিনিই বলাবেন, শুধু শুধু ভয় পাওয়ার অর্থ গুরুকেই অবিশ্বাস করা। তাই আদেশ পাওয়া মাত্র উঠে দাঁড়ালেন শুদ্ধানন্দ। বলতে শুরু করলেন আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে। বৃহদারণ্যকে উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ থেকে প্রায় আধঘণ্টা ধরে তিনি ভাষণ দিলেন আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে। শিষ্যের সে ভাষণে প্রীত হয়েছিলেন গুরু। প্রশংসাবাক্যে উৎসাহিত করেছিলেন সেদিন তিনি তাঁকে। স্বামীজীর সেই উৎসাহের কথা স্মরণ করেই পরবর্তীকালে আবেগ-মথিত ভাষায় স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখেছিলেন, "আর এরূপ উৎসাহদাতা ভরসাদাতা কোথায় পাইব? কোথায় পাইব এমন ব্যক্তি যিনি শিষ্যবর্গকে লিখিতে পারেন, আই ওয়াণ্ট ইচ অব মাই চিলড্রেন টু বি এ হানড্রেড টাইমস গ্রেটার দ্যান আই কুড এভার বি। এভরি ওয়ান অব ইউ মাস্ট বি এ জায়েণ্ট—মাস্ট—দ্যাট ইজ মাই ওয়ার্ড। আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যাহা পারিতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হইতে হইবে—হইতেই হইবে—নহিলে চলিবে না।" গুরুর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাঁর নিজের চেষ্টা যেমন ছিল আন্তরিক তেমনি তিনি তাঁর নিজের শিষ্যদেরও বারবার বলতেন তোমরা বড় হও—আমার চেয়ে অনেক—অনেক বড় হও।

স্বামীজীর অকাল প্রস্থানের ফলে তাঁর পুণ্যসঙ্গ বেশিদিন করার সুযোগ পাননি শুদ্ধানন্দ। কিন্তু যে অল্পদিন তিনি তাঁর কাছাকাছি ছিলেন তাতেই উপচে উঠেছে তাঁর পাত্র। নানাভাবে—নানা ইঙ্গিতে তিনি তৈরি করে গেছেন ভবিষ্যতের সংঘপ্রধান স্বামী শুদ্ধানন্দকে।

"জ্ঞানীবর শুদ্ধচিত্ত কে তুমি সন্ন্যাসী !
স্বামী-বরে তব অপরূপ মেধা
বঙ্গ অনুবাদে করিলে সমাধা ;—
যথা তুমি রহ, জ্ঞানের প্রবাহ,—
বিচারশীল স্বভাবে বিরাজ··· ।"

এ সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ। ১৯৩৫ সালের শেষদিকে হিমালয় থেকে নামার পথে হরিদ্বারের কনখল সেবাশ্রমে যখন তিনি আসেন তখন তাঁর এই বন্দনাগীত রচনা করেন স্বামী কল্যাণানন্দজী। সেদিন শুদ্ধানন্দের সেই অভিনন্দন সভায় কল্যাণানন্দজী বলেছিলেন, "ইনি আমাদের সবার মাথার মণি।" সত্যিই তাই। কেননা, বিবেকানন্দের বাণীকে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার প্রায় চোদ্দআনা কৃতিত্বই তাঁর।

ব্যাস বিবেকানন্দের গণেশ লেখক হয়ে বসেছিলেন শুদ্ধানন্দজী মঠে আশ্রয় নেবার প্রায় পরে পরেই। তারপর ভাগ্যগুণে তাঁরই ওপর পড়েছিল স্বামীজীর ইংরেজি রচনার অনুবাদ, স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে স্বামীজীর বাণী সংকলন ইত্যাদির ভার।

একদিন এক আশ্চর্য যোগাযোগ। শুদ্ধানন্দজী যখন মঠে যোগ দেন প্রায় সেই সময়ই স্টার্ডি সাহেব ইংলণ্ড থেকে স্বামীজীর জ্ঞানযোগ সম্পর্কে দেওয়া বক্তৃতাগুলি ছোট ছোট বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে থাকেন। মঠে সবাই তখন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন সে বই। বুড়ো গোপাল বা স্বামী অদ্বৈতানন্দেরও খুব ইচ্ছে করত বিদেশে তাঁদের নরেন বেদান্ত নিয়ে কি বলেছে তা জানতে। কিন্তু ইংরেজিতে তাঁর তেমন দখল না থাকায় সেসব বই তিনি পড়তে পারতেন না। তাঁর মনের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে মঠের নবীন ব্রহ্মচারীরা তাঁকে সেসব ইংরেজি বইয়ের বাংলা তর্জমা শোনাতেন। আনন্দে ভরে উঠত স্বামী অদ্বৈতানন্দের মন-প্রাণ। স্বামী প্রেমানন্দ ওইসময় ব্রহ্মচারীদের বলেন, তোমরা এক কাজ করনা কেন ? সবাই স্বামীজীর বক্তৃতার ওই বইগুলির বাংলা তর্জমা করতে থাক। নতুন উৎসাহে ব্রহ্মচারীরা শুরু করে দেয় কাজ। স্বামী প্রেমানন্দ নিজে প্রথমে সেইসব অনুবাদ দেখে নেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ দার্জিলিঙ থেকে ফেরার পর স্বামী প্রেমানন্দ একদিন তাঁকে বললেন, নরেন, ছেলেরা তোমার বক্তৃতার বেশ অনুবাদ করেছে। তুমি একদিন শোননা কেন ওগুলি। স্বামী প্রেমানন্দের কথায় রাজি হন স্বামীজী। তারপর মঠের সেই বড় হলঘরেই বসল নবীন

ব্রহ্মচারীদের তর্জমা সেই শোনার আসর। স্বামীজী বেশ মন দিয়েই শুনলেন সেইসব অনুবাদ। তিনি প্রশংসা করলেন সবারই কিন্তু তাঁর পছন্দ যে বেশি হয়েছিল স্বামী শুদ্ধানন্দকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর একটি কথায়। তিনি শুদ্ধানন্দকে বললেন, তুই রাজযোগটার তর্জমা করনা। এতো অনুরোধ নয়, এ আদেশ। গুরুগতপ্রাণ শুদ্ধানন্দ মাথা পেতে নিলেন সে আদেশ। শুরু হ'ল রাজযোগের বাংলা তর্জমা।

এই তর্জমা সম্পর্কে স্বামী শুদ্ধানন্দ পরে তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূর্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম······রাজযোগের অভ্যাস করিলে······আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? যাহা হউক স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

স্বামীজীর মনে উদ্দেশ্য যাই থাক শুদ্ধানন্দ কিন্তু অপূর্ব নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সঙ্গে অনুবাদ করতে লাগলেন। এই অনুবাদ করাটাকেও তিনি গুরুসেবা বলেই মনে করতেন। 'রাজযোগ'-এর পর স্বামীজীর 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'জ্ঞানযোগ' এবং অন্যান্য বইয়েরও অনুবাদ তিনি করেন। স্বামীজীর ভাব, স্বামীজীর ভাষা এবং রচনাশৈলীকে তিনি এমনভাবে আত্মস্থ করেছিলেন যে, ওইসব অনুবাদকে কখনই অনুবাদ মনে হয় না। মনে হয় এসবই যেন স্বামীজীর মূল রচনা। শুধু ওইসব গ্রন্থ নয়, 'দি সঙ অব দি সন্ন্যাসীন'-এর মত কাব্যের অনুবাদ 'সন্ন্যাসীর গীতি'-তে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর অপূর্ব বৈদগ্ধ্য এবং কাব্যানুভূতির। এইসব অনূদিত বই-ই বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল বিবেকানন্দের ভাবনা এবং বাণীকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব প্রচারে এগুলির ছিল এক অসাধারণ ভূমিকা।

শুধু অনুবাদ নয়, শুদ্ধানন্দ ছিলেন শ্রুতিধরও। এবং তাঁর এই অদ্ভুত শক্তির জন্যই আমরা পেয়েছি বিবেকানন্দের 'গীতাতত্ত্ব'-এর মত একটি সুচিন্তিত বই।

মঠ তখন আলমবাজার থেকে উঠে এসেছে বেলুড়ে। সেখানে একদিন সমবেত সবার কাছে স্বামীজী গীতা সম্পর্কে বেশ উদ্দীপনাময় কিছু কথা বলেন। তাঁর

সেদিনের সেই ভাষণ শুনে অনেকেরই 'গীতা' সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ দেখা দেয়। কয়েকদিন সবাই যেন মগ্ন ছিলেন গীতার অনুধ্যানে।

গীতা সম্পর্কে স্বামীজীর ভাষণের পর পার হয়ে গেছে তিন-চারটে দিন। স্বামী প্রেমানন্দ হঠাৎ শুদ্ধানন্দকে ডেকে বলেন, হ্যাঁহে একটা কাজ করতে পারবে ?

বলুন ?

সেদিন গীতা সম্পর্কে স্বামীজীর বিশ্লেষণ শুনেছ তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মনে আছে সব ?

তা কিছুটা আছে।

তাহলে এক কাজ করনা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে স্বামীজীর ওই বক্তব্যটা লিখে ফেল না। এটা করলে কিন্তু একটা স্থায়ী কাজ করা হবে।

প্রেমানন্দজীর কথায় শুদ্ধানন্দ নিজের প্রাণেও যেন একটা তাগিদ অনুভব করলেন। কাগজ কলম নিয়ে বসলেন তিনি। তারপর সেদিন স্বামীজী গীতা সম্পর্কে যা-যা বলেছিলেন সব তিনি লিখে যান হুবহু। আর এরই ফলে প্রকাশিত হ'ল 'গীতাতত্ত্ব'। পরে এটি 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে সংযোজিত হয়। বইটিতে শুধু স্বামীজীর কথা নয়, সেই কথা বলার সময় স্বামীজী যখন যেরকম ভঙ্গি করেছিলেন তার পর্যন্ত নিখুঁত বর্ণনাটি দিয়েছিলেন তিনি। বইটি যে বিবেকানন্দের মূল রচনা নয়, বারবার পড়েও তা বোঝা যায় না।

এই কাজটি করার সময় শুদ্ধানন্দ মনে-প্রাণে আশ্চর্য এক উদ্দীপনা অনুভব করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথন : "হে পাঠকবর্গ, সেই মহাপুরুষের যে ছবি দেখিয়াছি এখনও যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাহা তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হউক। তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আজ আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে মহাপণ্ডিত, মহাতেজস্বী, মহাপ্রেমিকের ছবি জাগিতেছে। তোমরাও একবার আমার সহিত দেশকালের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদের স্বামীজীকে দেখিবার চেষ্টা কর······স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না।' 'মহাপাপীকে ঘৃণা করো না' এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মুখ হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ করিতেছে—তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।"

স্বামীজির নির্দেশ পালনে প্রতিমুহূর্ত তাঁর অনুধ্যানে কাটতো, তাঁকেই ইহজীবন পরজীবনের সর্বস্ব জেনে শুদ্ধানন্দ যেমন ছিলেন এক অনন্য সাধনায় রত তেমনি স্বামীজীও বিশেষ করে তাঁর এই প্রিয় শিষ্যটির আত্মিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর রেখেছিলেন। শিষ্যের প্রাত্যহিক কাজ কর্মের কোনটিই তাঁর নজর এড়িয়ে যেত না। শুদ্ধানন্দকে যোগ্য আধার জেনে তাঁকে ঠিকমত তৈরী করার জন্য সবসময় ছিলেন তিনি সচেষ্ট। কামিনী কাঞ্চনের সামান্য মালিন্যও যাতে শিষ্যের অন্তরে না লাগে সেদিকে ছিল তাঁর সদাসতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একদিনের ঘটনা বললেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তখন বেলুড় মঠকে বিনা দামে প্রতিদিন একটি করে সংবাদপত্র দিত। কিন্তু এটি নেওয়ার ব্যাপারে ছিল ছোট্ট একটা ঝামেলা। পত্রিকাটির সাইকেল পিয়ন আসত বরানগর পর্যন্ত। তাই মঠের পত্রিকাটি তারা রেখে যেত বরানগরের এক বিধবা আশ্রমে। দুপুরবেলা সেটি আনা হত মঠে। এ কাজটা করতেন স্বামী নির্ভযানন্দ। প্রতি দুপুরেই নির্ভয়ানন্দ এই কাজটা করেন। কিন্তু একদিন তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল যদি কোন কারণে তিনি অসুস্থ হযে পড়েন কিংবা মঠের অন্য কাজে জড়িয়ে যান তাহলে তো কাগজ আনা বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় একজন কেউ বরানগরের ওই বিধবা আশ্রমটি চিনে রাখলে সেরকম কোন সমস্যায় পড়তে হবে না ভেবে নির্ভয়ানন্দ একদিন শুদ্ধানন্দকে নিয়ে গেলেন বরানগর বিধবা আশ্রমে।

প্রতিদিন দুপুর বেলায় শুদ্ধানন্দ বেদান্ত পড়তেন স্বামীজীর কাছে। মঠে স্বামীজী যে ক'দিন থাকতেন তার একটি দিনও কামাই যেত না তাঁর। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যায় অথচ শুদ্ধানন্দ বেদান্তের পাঠ নিতে এলেন না দেখে চিন্তিত হলেন স্বামীজী। শুদ্ধানন্দের কি হযেছে সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানলেন, শুদ্ধানন্দ বরানগর বিধবা আশ্রমে গেছেন। কথাটা শুনেই মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল স্বামীজীর। তিনি শুধু বললেন, সুধীর ওখানে গিয়ে ভাল করেনি। তার ওপর যে কাজের ভার নেই, কোন অজুহাতেই তার তা করতে যাওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে মেয়েদের আশ্রমে তরুণ সাধুর এই যাওয়াটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

শুদ্ধানন্দ কাগজ নিয়ে ও মঠে ফিরেই শুনলেন, স্বামীজী তাঁর এই যাওয়াটা অনুমোদন করেননি। কেন করেননি তাও শুনলেন। শুনে বুঝলেন সব এবং সারাটা জীবনই তিনি অনুসরণ করে চলেন এই শিক্ষাকে।

পরবর্তীকালে শুদ্ধানন্দ লিখেছিলেন, 'যেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া

যাত্রার জন্য কলকাতা যাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারীগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে এখনও বাজিতেছে—'দেখ্ বাবা ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের একদম সংস্পর্শে আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না, তাঁরা সাক্ষাৎ ভগবতী স্বরূপা, কিন্তু নিজেদের বাঁচাবার জন্য তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে বলছি। সংসারে থেকেও ধর্ম হয় আমি অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিস নে যে আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করবো, সেসব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী। তাদের মনে কতকটা সায় দিয়ে যাতে ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক হয় সেইজন্য এভাবে লেকচার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভিতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকু ধর্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করবি।'

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাসী ছিলেন উপদেশ নয়, উদাহরণে। তাঁর নিজের জীবনচর্যায় যা তিনি অনুসরণ করেননি অথবা করতে পারেননি—সেটি ভক্ত শিষ্যরা পালন করুক এমন কথা তিনি সরাসরি বলতেন না। বলতেন না বলেই সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের যে নিয়মাবলী তিনি প্রণয়ন করেন তাতে অন্যসব ধূমপান নিষিদ্ধ করলেও তামাকের ওপর তিনি কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি। তিনি নিজে খুব বেশি তামাক খেতেন বলেই তামাককে নিষেধের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়। তবে তামাক খাওয়া যে ভাল নয়, এ অভ্যাস যে ত্যাগ করা দরকার সে সম্পর্কেও তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। স্বামী শুদ্ধানন্দের সঙ্গে প্রথম যেদিন স্বামীজীর কথা হয় সেদিন তিনি হঠাৎই জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুই কি তামাক খাস?

সেদিনের তরুণ সুধীরচন্দ্র স্বলজ্জ ভঙ্গিতে বলেছিলেন, আজ্ঞে না।

কখনও খাস না?

না।

উত্তরটা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন স্বামীজী। বলেছিলেন হ্যাঁ অনেকে বলে—তামাক খাওয়াটা ভাল নয়। আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।

এই ঘটনা যেমন স্বামীজীর চরিত্রের একটি দিককে আলোকিত করে তেমনি সুধীরচন্দ্রের জীবন সম্পর্কেও আমরা কিছুটা জানতে পারি। সুধীরচন্দ্রের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল যে সংস্কার তাই তাঁকে টেনে আনে মঠের কাছাকাছি।

স্বামী শুদ্ধানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী। থাকতে কলকাতার সার্পেনটাইন লেনে। তাঁর বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী ছিলেন স্বধর্মনি অথচ উদারচেতা এক ব্রাহ্মণ। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ১২৭৯ সালের শুক্লা মহাষ্টমী তিথিতে সুধীরচন্দ্রের জন্ম। ছোটবেলা থেকেই সম্ভবত ধর্মাচরণে আকৃষ্ট হয়ে তিনিও বেশি মাত্রায় ধর্মের পথে অগ্রসর হন। সেই অল্প বয়সেই সাধুসন্ন্যাসীর কথা শুনলে তাঁদের দেখবার জন্য ছুটে যাওয়া, সমবয়সী বন্ধুবান্ধব নিয়ে ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করা, ধর্মপুস্তক পড়া ইত্যাদিতে ছিল সুধীরচন্দ্রের বেশি ঝোঁক। এসব করলেও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে পড়াশোনায় কখনও খারাপ ফল করেননি। অন্যদিকে বাবাও শাসন করে ছেলের ধর্মসাধনার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করেননি। বরং ছেলে ধর্মের পথে যাক এটাই ছিল তাঁর মনোগত বাসনা।

বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুধীরচন্দ্র ভর্তি হলেন কলকাতার সিটি কলেজে। এই কলেজে পড়ার সময়ই তাঁর এমন একদল বন্ধু জুটে গেল যাঁরা দিনরাত ধর্মের নানা কথা আলোচনা করেই দিন কাটাতেন। তাঁর এই বন্ধু দলে ছিলেন খগেন, কালীকৃষ্ণ, হরিপদ, গোবিন্দ শুকুল প্রভৃতি। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠে এঁরা যোগ দেন এবং সন্ন্যাস নিয়ে হন বিমলানন্দ, বিরজানন্দ, বোধানন্দ এবং আত্মানন্দ। এরা সবাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী প্রচারে নিয়েছিলেন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। সুধীরচন্দ্র বাদে তাঁর এই বন্ধুদের সবাই পড়তেন রিপণ কলেজে। ভিন্ন কলেজে পড়লেও তাঁদের মানসিক ভাব আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনদিন কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি কখনও।

মূলতঃ বন্ধু খগেনের বাড়িতেই ছিল তাঁদের প্রধান আড্ডা। পাঠ, আলোচনা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদিতে মেতে থাকতেন তাঁরা। তাঁদের ডিবেটিং ক্লাবে বাংলা এবং ইংরেজী দু' ভাষাতেই প্রায় নিয়মিত হত বিতর্ক বা আলোচনা। আর এ সবেরই কেন্দ্রমণি ছিলেন সুধীরচন্দ্র।

একদিকে যখন জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে চলছে চিত্তের শুদ্ধতা দূর করার চেষ্টা অন্যদিকে তেমনি চলে যোগ সাধনা। শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য আর্যমিশন ইনসটিটিউটের শিক্ষক এবং যোগীগুরু শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্যের কাছে ছিল সুধীরচন্দ্রের নিত্য যাতায়াত। এই সূত্রেই তাঁর বেশভূষা ও আহারের ক্ষেত্রে আসে কৃচ্ছ্রতা। কোনরকম জামা না পরে তিনি খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। এমনকি কলেজেও তিনি যেতেন এইভাবেই জামা জুতো না পরে।

সিটি কলেজের ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় এটা ছিল রীতিমত বেয়াদপি। এই অবস্থায় কলেজে আসার জন্য একদিন হেরম্ব মৈত্রের প্রচণ্ড বকুনিও খেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে বকুনিতেও তাঁর জীবন যাত্রায় ঘটেনি এতটুকু অদলবদল।

এই সময় তাঁরা কয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করলেন, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে সারারাত ধ্যান করে কাটাবেন। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। খগেন, কালীকৃষ্ণ, সুধীর প্রভৃতি কয়েকজন পানসি করে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। সুধীরের সেই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসা। এর আগে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনলেও বা তাঁর উপদেশ পড়লেও তাঁকে দেখেননি। আর এবার যখন এলেন তার বহু আগেই অপ্রকট হয়েছেন ঠাকুর। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখার খেদ ছিল চিরদিন স্বামী শুদ্ধানন্দের মনে। মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে এক চিঠিতে তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, "আমার নিজের জীবনের কথা তোমায় আর বিশেষ কি লিখিব? শ্রীশ্রীঠাকুর যখন স্থূল শরীরে বর্তমান ছিলেন তখন অল্প বয়স হইলেও তাঁহার কথা অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহার ছাপা উপদেশও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই নাই।"

বাড়িতে সবার স্নেহ-ভালবাসা, লেখাপড়া শিখে সুখী জীবন যাপনের হাতছানি, নিরাপদ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার মধ্যে কি জানি কি এক অভাব, এক অনির্দেশের আহ্বান সুধীরচন্দ্রকে উতলা করে তোলে। সেই অনির্দেশের ডাকে দু'বার তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন পথে—একবার পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন দেওঘরেও—তবু ঘর ছাড়া তাঁর তখন হয়ে ওঠেনি। দুবারই ফিরে এসে মগ্ন হতে হয়েছিল লেখাপড়ায়। কিন্তু মানসিক অস্থিরতা শেষ পর্যন্ত তাঁর বি. এ. পরীক্ষা দেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। পড়াশোনায় ইতি টানতে হ'ল এইখানেই।

১৮৯০ সাল থেকেই বরানগর মঠ ও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সুধীর এবং তাঁর বন্ধুরা যাতায়াত শুরু করেছেন। বরানগর মঠে যোগীন মহারাজের সঙ্গে তাঁরা নানাবিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন। ধীরে ধীরে ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদদেরও সঙ্গ পেয়েছেন—পেয়েছেন তাঁদের উপদেশ স্নেহ ভালবাসা। তাতে তাঁদের মন প্রাণ সব শীতল হযে যেত, খুঁজে পেতেন ভবিষ্যতের পথ।

স্বামী শুদ্ধানন্দর নিজের কথায়, "আমি যখন ১৮৯০ সালে প্রথম বরাহনগর মঠে যাই তখন তাঁহাকে (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) তথায় দেখিয়াছি মনে আছে। সেদিন গিরিশ ঘোষ ও অভেদানন্দ স্বামী.........নানা ফিলজফিক্যাল ডিসকাশন করিতেছিলেন—আমি তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম—তাঁহার নিকট গিয়া

ভিজিটররা যেমন বসে, খানিক বসিলাম—বলা বাহুল্য, তাঁহাদের ডিসকাচ্সনে
মর্ম তখন আমি ধরিতে পারি নাই—তারপর যখন উঠিলাম, বেশ মনে আছে
গোপাল দাদা একটি ঘরে ঢুকিয়া সুরেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত 'রামকৃষ্ণ পরমহংস
দেবের উক্তি' ১ম ভাগ নামক একটি চটি বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'আ
ফিলজফির কথা হচ্ছিল—যা হোক্ এই বইখানা পড়ো—আর একদিন মঠে এসো।

শুরু হ'ল মঠে যাতায়াত। ওদিকে বিদেশ থেকে আসতে লাগল বিবেকানন্দে
বিশ্বজয়ের সংবাদ—ভেসে আসতে লাগল তাঁর অমোঘ বাণী। সেসব বাণী—সে
সংবাদ তরুণ প্রাণে জ্বালল উত্তেজনার মশাল। স্বামীজীর দর্শন পাবার জন্য চঞ্চ
হয়ে উঠল মন। অবশেষে এল সেই মহাক্ষণ।

১৮৯৭ সাল। মাসটা ফেব্রুয়ারি। স্বামীজী কলকাতায় এলেন। তাঁকে দর্শ
করার জন্য, স্বাগত জানাবার জন্য আরো বহু হাজার হাজার মানুষের স
সুধীরচন্দ্রও এলেন শিয়ালদায়। তাঁর সৌভাগ্য তিনি প্লাটফরমের যেখানে দাঁড়ি
ছিলেন ঠিক সেইখানেই এসে দাঁড়াল স্বামীজী যে কামরায় ছিলেন সেটি। ভা
গুরুর সঙ্গে চারচোখের মিলন হ'ল ভাবী শিষ্যের—সার্থক উত্তরসূরীর। শিয়াল
থেকে ঘোড়া নয়, মানুষ টানা রথে স্বামীজীকে আনা হ'ল রিপণ কলেজে। সেখা
তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন দু'চার কথা। সুধীরচন্দ্র কিন্তু সে
শুনছেন না, তিনি শুধু দেখছেন, প্রাণভরে দেখছেন তার আগামী জীবনে
কাণ্ডারীকে। তিনি দেখলেন, "মুখখানি তার তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতি ফা
বাহির হইতেছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন হইয়া
মাত্র।"

স্বামীজীকে সুধীরচন্দ্রের দ্বিতীয় দর্শন বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়িতে
এর কয়েকদিন পরেই। সেদিনও কিন্তু কোন কথা হয়নি দুজনের মধ্যে। এর
কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে আবার মুখোমুখি হ'লেন গুরু-শিষ্য
স্বামীজী আর সুধীরচন্দ্র। কথা হ'ল দু'জনে। আরেকদিন সুধীর তাঁর
খগেনের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় গেছেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। সেটি
শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হরমোহন মিত্র স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের বিশেষভাবে পরি
করিয়ে দেবার জন্য বললেন, "স্বামীজী এরা আপনার খুব অ্যাডমায়ারার এ
বেদান্ত আলোচনা করে।" কথাটা শুনেই স্বামীজী সুধীরকে জিজ্ঞেস করলে
উপনিষদ কিছু পড়েছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।

কোন্ উপনিষদ পড়েছ ?

কঠ উপনিষদ পড়েছি।

বেশ বেশ, বলতো কিছুটা শুনি।

মহাফাঁপড়ে পড়লেন সুধীরচন্দ্র। গীতা তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ থাকলেও, উপনিষদ তাঁর তখনও মুখস্থ হয়নি। তাই একটু কুণ্ঠার সঙ্গে তিনি বললেন, আজ্ঞে কঠটা মুখস্থ নেই। গীতা থেকে কিছুটা বলব ?

আচ্ছা, তাই বল।

সুধীরচন্দ্র বলতে শুরু করলেন,—স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা· · · গীতায় একাদশ অধ্যায়ের অর্জুনকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব।

আবৃত্তি শুনে তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্যই বললেন, বেশ, বেশ।

পরদিন বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে নিয়ে আবার এলেন স্বামীজীর কাছে। সেদিনও কথায় কথায় আবার এল উপনিষদ প্রসঙ্গ। সুধীরচন্দ্র এদিন তৈরি হয়ে সঙ্গে এনেছিলেন উপনিষদ গ্রন্থাবলী। তার থেকে একসময় শুরু হ'ল পাঠ। মাঝে মাঝে স্বামীজী সেইসব শ্লোকের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন তাঁর তেজস্বিনী ভাষায়। সুধীরচন্দ্র মুগ্ধ। নিজেকেই তিনি সমর্পণ করে বসলেন স্বামীজীর পায়ে। পরবর্তীকালে স্বামী শুদ্ধানন্দ বলেছন, "এই দুইদিনের উপনিষৎ প্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।" স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, "যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভুলিয়া থাকি, তখন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য ঘোষণা—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

স্বামীজীর সঙ্গে এইসব দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে কেটে গেছে দু'টি মাস। মানসিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে সুধীরচন্দ্রের। বুঝতে পারেন না কি করবেন তিনি ? তাঁর নিজের কথায় "আমার ছোটভাই প্রকাশানন্দ প্রথম মঠে যোগদান করেন। তাঁর সাধু হবার পর বেশ কিছুদিন আমার যে কি অবস্থা গিয়েছে তা বলার নয়। বাড়ি ছেড়ে সাধু হওয়া, কি বাড়িতে থেকেই ধর্মজীবন-যাপন করা—কোনটি আমার সিদ্ধিলাভের সহায়ক হবে এই চিন্তায় বিষম সংশয়াকুলচিত্তে মাসের পর মাস কাটিয়েছি। মনে ঘোর অশান্তি—কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিলাম না।

আলমবাজার মঠে যাতায়াতও নিয়মিত চলছে। এমন সময়ে একদিন একজ
সাধুর মুখে শুনলাম, 'ঐ যে গাজনের সন্ন্যাসী দেখছ, এরাও ঠিক ঠিক করে
যে ক'দিনের জন্যই হোক, সংসারীদের চেয়ে এরা অনেক উঁচুতে।' এই কথ
শোনামাত্রই মনে এত জোর পেলুম যে, সেইদিনই সাধু হবার সংকল্প ঠিক করে
ফেললাম। মনে আর কোন দ্বিধা থাকল না।"

১৮৯৭ সালের এপ্রিলে ঘর ছেড়ে মঠবাসী হলেন সুধীরচন্দ্র। স্বামীজী তাঁকে
ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ নামে সংঘভুক্ত করলেন। এল ১৮৯৭-এর মে—১৩০৩ সালের
১৯ বৈশাখ—স্বামীজী তাঁকে দিলেন মন্ত্রদীক্ষা। মহামন্ত্র দান করার আগে স্বামীজী
জিজ্ঞেস করলেন, তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে?

কখনও সাকার ভাল লাগে, কখনও নিরাকার ভাল লাগে।

তা নয়, গুরু বুঝতে পারেন কার কি পথ; হাতটা দেখি।

সুধীরচন্দ্র বাড়িয়ে দেন তাঁর ডান হাত। সেটি ধরে খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে
তাঁকে বললেন,……এই মন্ত্রে তোর সুবিধে হবে।

সেদিন মন্ত্র দেবার পর সামনে পড়ে থাকা কয়েকটি লিচু নিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতে
নির্দেশ দিলেন স্বামীজী।

পরের বছর সেপ্টেম্বর মাস। ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ এপ্রিল থেকেই রয়েছেন স্বামী
নিরঞ্জনানন্দের কাছে আলমোড়ায়। সেখানেই ১৬ সেপ্টেম্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের
প্রতিকৃতির সামনে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বিরজা হোম করে তাঁকে দেন সন্ন্যাস
ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ হলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ।

স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁর সাধনজীবনে বেদান্তের পাঠ নিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামীজী
কাছ থেকে। ব্রহ্মসূত্র পড়াতে পড়াতে স্বামীজী তাঁকে বলেন, 'ভাষ্য না পড়ে এখ
স্বাধীন ভাবে সকল সূত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর।' পড়াবার সময় স্বামীজী
প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝিয়েই ক্ষান্ত হতেন না—শব্দের প্রকৃত উচ্চার
সম্পর্কেও শিষ্যকে অবহিত করতেন। তিনি বলতেন পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে
বলেছেন, অপশব্দ উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ—আমরা সকলেই তো পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ
হয়েছি। আবার একদিন তিনি বলেন, দেখ মঠের একটা ডাইরি রাখবি। আর
হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা রিপোর্ট পাঠাবি। শুদ্ধানন্দ সারাজীবন সে আদেশ
অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সে ডাইরি এখন মঠের ইতিহাসের এক অমূল্য
উপাদানে ভরা।

১৮৯৭ সালের মে মাসে স্বামীজীর পশ্চিম ও উত্তর ভারত সফরের সময় কিছুদিন শুদ্ধানন্দও ছিলেন তাঁর সঙ্গী।

১৮৯৯ সালে স্বামীজীর প্রেরণায় বেলুড় মঠের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ হন তাঁর প্রথম সম্পাদক। সেই সম্পাদনা কাজে তাঁকে সবরকম ভাবে সাহায্য করতেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ইউরোপে গেলে স্বামী শুদ্ধানন্দ হন উদ্বোধনের দ্বিতীয় সম্পাদক। তিনি দশবছর ওই পদে ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য রচনাবলীর অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন ওর সঙ্গে নিজে লিখেছেন কম করে ৭৮টি প্রবন্ধ ও কবিতা। তিনি উদ্বোধনে প্রকাশ করেছিলেন স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' এবং শ্রীম লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। উদ্বোধন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী প্রকাশও তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

১৯০৩ সালে তিনি বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টি হন। পরে নির্বাচিত হন মঠ ও মিশনের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯২৬ সালে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে প্রথম মহাসম্মেলন হয় শুদ্ধানন্দই ছিলেন তার মূল উদ্যোক্তা। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে হন মঠের সহকারী অধ্যক্ষ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মহাপ্রস্থানের পর ১৯৩৮ সালে মে মাসে তিনি হ'ন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বা সভাপতি। কিন্তু ওই বছরের ২৩ অক্টোবর তিনি রামকৃষ্ণ লোকে গমন করেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁর সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জন্য করে গেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। তবে তাঁর কর্মপরিধি শুধু মঠ ও মিশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিবেকানন্দর ভাবধারা বাংলার যুবকদের প্রাণের মধ্যে উপ্ত করার জন্য তিনি ছিলেন সচেষ্ট। বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁরই কর্মোদ্যম। একদিক থেকে তিনিই ছিলেন সোসাইটির প্রাণ।

বেলুড় মঠে যে চতুষ্পাঠী আছে তার প্রতিষ্ঠার পিছনেও ছিল তাঁরই ঐকান্তিক ইচ্ছা। ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তিনিই অস্পৃশ্য জাতিদের জন্য যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাঁরই কর্মদক্ষতায় মঠ ও মিশনের ভিত্তিভূমি হয়েছিল আরও দৃঢ়। যখন যে কাজ তিনি করতেন তাকেই মনে করতেন ভগবদ্ উপাসনা। তিনি বলতেন, "দেখ স্বামীজীর কৃপায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে আমি এটুকু বুঝেছি যে, আমাদের সর্বকর্ম—তা রিলিফই হোক, স্কুল-কলেজের শিক্ষাই হোক,

বা ডাক্তারখানা হাসপাতালই হোক, অথবা বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাশ করা যাই হোক সবই হচ্ছে ভগবদ্ উপাসনা—তাঁরই মহিমা প্রচার।"

অনন্য সাধারণ দূর দর্শিতার সঙ্গে তিনি করতেন সংঘ পরিচালনা। কলকাতা এক সংঘের পরিচালককে তিনি লিখেছিলেন, "মূল কথা এই, ভিতরের প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতির অভাব হইলে রিলিজিয়াস সোসাইটির ভিতরও এইসব আইন কানুন ভোটাভুটির ব্যাপার আসিয়া পরে। আসলে যে কারণে লোকে কোন ধর্মসমাজের সভ্য হয়, অর্থাৎ 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' তাহা আর স্মরণ থাকে না। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলের ভিতর সুবুদ্ধি দিন এবং কামিনী, কাঞ্চন প্রভুত্ব স্পৃহা প্রভৃতির মোহ হইতে রক্ষা করুন।"

এ শুধু কোন উপদেশ নয়—এ তাঁর জীবন দর্শন। এই বোধকে চিরজাগ্রত রেখেই তিনি করে গেছেন কাজ এবং কাজ শেষে পেয়েছেন সেই পরমের আশ্রয়।

স্বামী বিরজানন্দ

নিরঞ্জনং নিতং অনন্ত রূপং ভক্তানুকম্পাধৃত বিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং ত্বং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥

ধ্যান কোথায় কর? হৃদয়ে না সহস্রারে?

সহস্রারে। ওখানে ধ্যান করতেই ভাল লাগে। খুব আনন্দ পাই।

কথাটা শুনেই মা সারদামযী বলে উঠলেন, করেছ কি বাবা? ওযে শেষ অবস্থার কথা পরমহংস অবস্থার কথা। একেবারেই কি অত উঁচুতে মনকে রাখতে পারা যায়? প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে নামিয়ে এনে সেখানে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়।

প্রথম অবস্থাতেই মনকে সহস্রারে বসিয়ে যিনি পরমানন্দ আস্বাদন করতেন তিনি হলেন স্বামী বিরজানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের পর তিনিই ছিলেন মঠের প্রাচীন আবাসিক।

স্বামী শুদ্ধানন্দ বা সুধীর মহারাজ ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু। একইসঙ্গে তাঁদের যাত্রা সাধনপথে। মঠে অবশ্য তিনি যোগ দেন সুধীরের আগে। স্বামী বিবেকানন্দের কৃপাও পান আগে। তাঁর সন্ন্যাসও দেন স্বামীজীই। সেটা ১৮৯৭ সালের প্রথম দিকের কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর ১৮৮৭ সালের ২ জানুয়ারি বরানগর মঠের বিরজা হোমের আগুন জেলে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন স্বামীজী এবং তাঁর গুরু-ভাইরা। তারপর ওইদিনই প্রথম আলমবাজার মঠে জ্বলল বিরজা হোমের আগুন। একই দিনে সন্ন্যাস নিয়ে কালীকৃষ্ণ হলেন বিরজানন্দ, সুধীর মহারাজের ছোট ভাই সুশীল হ'ল প্রকাশানন্দ আর যোগেন চাটুজ্যে হ'ল নিত্যানন্দ।

সেদিন মঠে এই উত্তম নবীন সন্ন্যাস প্রার্থীর আত্মশ্রাদ্ধের কাজে পৌরোহিত্য করেছিলেন স্বামীজীর গৃহস্থ শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী আর পূজা, মন্ত্র পাঠ করে বিরজা

হোমের আগুন জ্বালেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়ে স্বামীজী কালীকৃষ্ণের নতুন নাম রাখলেন বিরজানন্দ। তখন বিরজানন্দের বয়স ২৪ বছর।

নবজীবনে উত্তরণের সেই মধুময় স্মৃতি চির অমলিন ছিল স্বামী বিরজানন্দর হৃদয়ে। সে স্মৃতি রোমন্থনে পরেও তিনি হতেন রোমাঞ্চিত।

সেদিন সেই সন্ন্যাসদানের মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের যে রূপ তিনি দেখেছিলেন তা হয়েছিল তাঁর সারাজীবনের সম্পদ। বিরজানন্দের স্মৃতিচারণ: তাঁর স্বতঃপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল হোমাগ্নির উজ্জ্বল প্রভায় অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'ল, যেন সাক্ষাৎ অগ্নিদেবতা নরবিগ্রহ ধারণ করে সমাসীন। আমাদের সন্ন্যাস দীক্ষা দান করে স্বামীজীর সেকি আনন্দ। বোধহয় গৃহস্থের নবজাত পুত্র সন্তান হলেও এত আনন্দ হয় না।

সন্ন্যাসদানের পর নবীন সন্ন্যাসীদের প্রাণভরা আশীর্বাদ করে গুরু বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছ, ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" সেদিন বিবেকানন্দের দীপ্ত ঘোষণা ছিল—'এরা ব্রহ্মচর্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করবে।' ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার সে বাণী ব্যর্থ হয়নি। গোপালের মা মঠে এসে তাঁদের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ পেয়ে খুবই খুশি হলেন বিশেষ করে বিরজানন্দের নাম শুনে তিনি বললেন, 'আহা বেশ নামটি হয়েছে, ঠিক নাম হয়েছে—বিরজানন্দ—বেজার নেই।'

সত্যিই সেই ছোট বেলা থেকেই তাঁর বেজার ছিল না ধর্মকথা শোনায়—বেজার ছিল না পরবর্তীকালে গুরু সেবায়—আর্ত তাপিত মানুষের সেবায়। সন্ন্যাস জীবনের মধ্য দিয়েই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মুক্তির পথ—সার্থক সুন্দরভাবে ফুটে ওঠার পথ। বৈরাগ্য তাঁর কাছে আসেনি অকস্মাৎ, বৈরাগ্য ছিল তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল। তাঁর ওই বৈরাগ্য দেখেই বাবা ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ বসু চড়াও হলেন সেদিন ছেলের ওপর। জিজ্ঞেস করলেন, তোর আসল ভাবটা কি বল দেখি?

চিরদিনের শান্ত মুখচোরা কালীকৃষ্ণ সেদিন স্পষ্ট স্বরে বলেছিল, আমার আর পড়াশোনা করতে ভাল লাগছে না বাবা। ভগবানকে পাওয়ার জন্য বেশিটা সময় আমি সাধন ভজন করেই কাটাই।

ছেলের এই স্পষ্ট জবাবে একটু থমকে গিয়েছিলেন ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ। তারপর ধীর কণ্ঠে বলেন, দেখ, সংসার আর ভগবান ছুটো একসঙ্গে হয় না। যদি

সংসার করতে চাও তাহলে তোমাকে মানুষ হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। আর যদি ভগবানকেই চাও তাহলে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাঁর সাধনভজন করতে হবে। যাই কর, আবেগের বশে কিছু কোর না। তোমায় আমি তিনটে দিন সময় দিচ্ছি। বেশ করে ভেবে চিন্তে বল, তুমি কি চাও ?

সেদিন কালীকৃষ্ণের তিনদিন সময়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। মন তার তৈরিই ছিল। বাবার এই চরম হুঁশিয়ারি সেদিন তাকে কোন দোটানার মধ্যেই ফেলেনি। তিনদিন বাদে বাবার কাছে গিয়ে ধীরভাবে বলে কালীকৃষ্ণ, বাবা, আমি ঠিক করেছি ভগবান লাভ করার জন্যই আমি চেষ্টা করব। আমার মনে হয় এ পথে আমার খুব সাহায্য হবে যদি আমি বরানগরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদের কাছে থাকি।

ছেলের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে বাবা বললেন, উত্তম কথা। ধর্মজীবন-যাপন করতে হলে গর্ভধারিণীর অনুমতি নেওয়া দরকার। আমার দিক থেকে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই জানবে। চারছেলের একজন যদি ধর্মজীবন-যাপন করে সে তো আনন্দের কথা।

বাবার কথায় কালীকৃষ্ণের মনোবল আরো বাড়ে। সেই মুহূর্তেই তিনি যান মা'র কাছে। বললেন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা। মা নিষাদকালী দেবী বললেন, আমি কেন তোমার ধর্মপথে বাধা দেব বাবা ? আমার কোন আপত্তি নেই।

পরবর্তীকালে মা'র কথা বলতে গিয়ে বিরজানন্দ বলতেন, আমি বরাবরই মা'র খুব নেওটা ছিলুম। কিন্তু মাকে দেখেছি সংসারের সব কাজ তিনি করে যাচ্ছেন, কিন্তু কোনটার প্রতিই যেন কোন আসক্তি নেই। সত্যিকথা বলতে কি, সংসারে থেকেও এমন সংসারমুক্ত মানুষ আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি।'

এমন বিবেকবান যাঁর বাবা মা তাঁর সাধন পথ যে সুন্দর হবে তাতে আর সন্দেহ কি ? তাছাড়া যোগাযোগটাও হয়েছিল আশ্চর্য। অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধব যে ক'জন ছিল তাঁরাও ছিলেন বৈরাগ্যবান পুরুষ। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই হয়ে ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠের আবাসিক। খগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, সুশীল চক্রবর্তী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ শুকুল প্রভৃতি যাঁরা ছিলেন কালীকৃষ্ণের মনের দোসর তাঁরাই পরবর্তীকালে স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ নামে সারা বিশ্বে তুলে ধরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নামের জয় পতাকা।

বাড়িতে বাবার যে সব ধর্মপুস্তক ছিল তাই পড়েই কালীকৃষ্ণের মনে জ্বলে ওঠে বৈরাগ্যের দীপশিখা। ঘরের দরজা বন্ধ করে তিনি করতেন ধ্যান প্রার্থনা।

দিন যায়। মনের অস্থিরতা বাড়ে। কালীকৃষ্ণ এবং তাঁর বন্ধুরা তখন পড়েন রিপণ কলেজে। ওদিকে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে যাওয়া আসা শুরু হয়েছে। রামবাবু প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গেও হয়েছে যোগাযোগ। তাঁরা কাছে টেনে নিলেন তাঁদের। যোগোদ্যানের বহু কাজের ভারই তখন তাদের ওপর। এমন কি ঠাকুরের ভোগরাগের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ ইত্যাদিতেও নেমে পড়েছেন তখন তাঁরা।

এই রিপণ কলেজেই ইংরেজ পড়াতেন 'কথামৃত'কার শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কালীকৃষ্ণরা দেখেন রোজই অধ্যাপক পড়াবার পর চলে যান ছাদে চিলে-কোঠায়। সেখানে বসে দিনলিপি দেখে লিখে যান 'কথামৃত'। কৌতূহল বাড়ে, ভক্তিও। একদিন কালীকৃষ্ণ একা একাই চলে যান মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। পরম স্নেহে তিনি কাছে টেনে নেন তাঁকে। যোগোদ্যানে যাতায়াত আছে শুনে বললেন, দেখ, ঠাকুর ছিলেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী। তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে তাঁর যে সব শিষ্য কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করেছে তাঁদের সঙ্গ করতে হয়। বরানগর মঠে যাবে— দেখবে সেখানে তাঁর ত্যাগী সন্তানেরা সবস্ব ত্যাগ করে কি ভাবে জীবন যাপন করছেন। গৃহস্থ হাজার হোক ঠাকুরের ভাব ঠিক ঠিক রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না।

মাস্টারমশাই সেদিন আরো বলে দিলেন ; দেখ, সাধুদের জায়গায় শুধু হাতে যেতে নেই। অন্ততঃ এক পয়সারও কিছু নিয়ে যাবে।

একদিন ওঁরা রওনা হলেন। কালীকৃষ্ণ, খগেন, হরিপদ, আর কুঞ্জ। কলেজ ছেড়ে পালিয়ে চারজনে চললেন মঠে। সঙ্গে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে ঠাকুরের জন্য কেনা জিলিপি। সেদিনের সেই সুখস্মৃতির কথা বলেছেন পরবর্তীকালে স্বামী বিরজানন্দ। তাঁর কথায়, "গরমীকাল। বেলা সাড়ে দশটা থেকে রৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে, পথ ঠিক না জানার দরুন আমরা প্রায় দুপুর একটার সময় বরানগর মঠে এসে হাজির হলুম। তখন সকলে বড় ঘরে বিশ্রাম করছেন। জেগেই ছিলেন। শশী মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বুড়ো গোপাল মহারাজ, যোগীন মহারাজ, লাটু মহারাজ, খোকা মহারাজ, সারদা মহারাজ ও দক্ষ মহারাজ—এঁরাই তখন মঠে ছিলেন মনে পড়ে। আমরা প্রণাম করবার পর সকলে আদর করে বসিয়ে "কোত্থেকে আসছো-কি কর—কোথায় থাক, মঠের কথা কি করে জানলে ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমাদের বৃত্তান্ত শুনে তাঁরা খুব খুশি হলেন, খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁদের দেখে আমাদের এক নূতন রিভিলেসন মানে জ্ঞানোদয় হ'ল।"

এই জ্ঞানোদয়ের পর নতুন জগতে ঢোকার ছাড়পত্রটিকে পাকা করার তাগিদে বাবা-মা'র অনুমতি নিয়ে কালীকৃষ্ণ একদিন এসে ঠাঁই নিলেন মঠে। সেদিন অনুমতি দেবার আগে মা বললেন, তুমি মঠে যাবে আপত্তি নেই, কিন্তু আর তিনটে দিন থেকে যাও। তিনদিন বাদে তিনি নিজে গেরুয়া রঙে কাপড় ছুপিয়ে—সেই কাপড় পরিয়ে ছেলেকে পাঠালেন মঠে। সালটা ১৮৯১। কালীকৃষ্ণের বয়স তখন ১৭।

স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত ভালবাসতেন মঠের এই নতুন অতিথিকে। পরে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "কালীকৃষ্ণ চলো এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। আমাদের পৌঁছতে হবে প্রভুর কাছে। তুমিই তো বরানগর মঠে ঠাকুরের অদর্শনের পর প্রথম ত্যাগী ভক্ত।"

মঠে যোগ দেবার পর শুরু হ'ল কালীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের সান্নিধ্যে একদিকে চলল ধ্যান-তপস্যা, অন্যদিকে মঠের প্রতিটি কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন নিজেকে। প্রত্যেকের সেবায় নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করলেন তিনি। সেদিন তাঁর সেই সেবারূপ দেখে স্বামী সারদানন্দ একদিন বলেছিলেন, এ ছেলেটা কেরে, মায়ের মতো সেবা করে ?

এরই মধ্যে ১৮৯২ সালে জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় সবার সঙ্গে গেলেন জয়রামবাটিতে। ছোট্ট এই ছেলেটিকে সেদিন চিবুক ধরে আদর করলেন শ্রীশ্রীমা। সেই স্পর্শে কালী-কৃষ্ণের হৃদয়মন হ'ল অভিভূত। একসময় শেষ হ'ল পূজো। কালীকৃষ্ণ একদিনেই মা'র বেশ নেওটা হয়ে গেছেন। কাজকর্ম, ফাইফরমাস খাটতে শুরু করে দিয়েছেন। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে থাকেন কামারপুকুরে। কামারপুকুর সম্পর্কে তাঁর কথা, "সেখানে থাকাকালে এক অপূর্ব পবিত্রতা, শান্তি, আনন্দের ভাবে পূর্ণ হয়ে থাকতুম এবং ঠিক ঠিক বোধ করতুম—উই আর ট্রিডিং অন হোলি গ্রাউণ্ড— আমরা এক পুণ্যভূমির ওপর বিচরণ করছি। সেই পর্ণকুটিরের কি মোহিনী শক্তি। যেন ট্যানজিবল, ভাইব্রান্ট উইথ স্পিরিচুয়ালিটি—প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিকতায় মুখরিত, যেন পৃথিবী ছাড়া বোধ হ'ত।"

জয়রামবাটি থেকে এক সময় তিনি আবার ফিরলেন বরানগর মঠে। ফিরলেন, কিন্তু "শূন্য হৃদয় নিয়ে বরানগর মঠে ফিরে এলুম। শূন্য হৃদয়ই বা বলি কেমন করে ? মায়ের অপার্থিব ভালবাসায় ভরা হৃদয় নিয়ে ফিরে গেলুম। মা'র কথা সামান্য শুনে-ছিলুম তাতে কে জানত যে মা—এরকম মা—এরকম করে মন-প্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার হতেও আপনার করে নেবেন ? বাড়ির মাকে তো খুব ভালবাসতুম ও তিনিও কত ভালবাসতেন—কিন্তু এ যে জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার—মা।'

জয়রামবাটি থেকে আনন্দভরা মন নিয়ে এলেন কালীকৃষ্ণ, আর ওই সঙ্গে দেহে নিয়ে এলেন ব্যাধি ম্যালেরিয়া। সেই ব্যাধিতে ক্রমশঃ শীর্ণ হতে থাকেন তিনি। ১৮৯৩ সালে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাড়িতে কালীকৃষ্ণকে দেখে মা যেন শিউরে উঠলেন। বললেন, "বাবা তোমায় দেখে বড় কষ্ট হ'ল। তোমার কেমন গোলগাল শরীরটি ছিল, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এখন কি চেহারা হয়ে গেছে। ওরা সাধু ফকির মানুষ, তোমায় কি-ইবা খাওয়াবে। তুমি কিছুদিন বাড়ি গিয়ে থাকো—সেখানে ওষুধপত্র আর পুষ্টিকর পথ্যাদি করে শরীরটা সারিয়ে নাও। জননীর মুখে এ হেন আদেশ শুনিয়া কালীকৃষ্ণের তো মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কালীকৃষ্ণ নীরব। মা পুনরায় বলিলেন, তাই কর বাবা। তাতেই ভাল হবে।"

হঠাৎ করে মঠ ছাড়ার এ আদেশে কালীকৃষ্ণ যখন বেদনাহত, নিরন্তর চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলছেন বুক তখন স্বামী যোগানন্দ তাঁকে বললেন, তুই কাল সকালে আবার যা মা'র কাছে, বল তোকে মন্ত্র দীক্ষা দিতে, দেখবি শান্তি পাবি মনে। আশ্বস্ত হন কালীকৃষ্ণ। পরদিন মা'র কাছে গিয়ে মন্ত্র প্রার্থনা করলে তিনি পূর্ণ করলেন সে প্রার্থনা। উপদেশ দিলেন সাধনপ্রণালী সম্পর্কে। তারপর ভরা বৃষ্টির মধ্যে যখন নৌকায় উঠলেন তখন মা'ও বাইরে এসে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাকিয়ে রইলেন নৌকার দিকে—তাঁর সন্তানের দিকে।

কেটে গেল ১৪/১৫ মাস। বাড়িতে একদম নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে লাগলেন কালীকৃষ্ণ। বাড়ির যত্নে শরীর সারল, কিন্তু মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। সেই অবস্থায় মনের সবটুকু আকুতি মিশিয়ে একটা চিঠি লিখলেন জয়রামবাটিতে মা'র কাছে। লিখলেন এভাবে চললে তিনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন। তাই তাঁর মিনতি,—"মা, আপনি যদি অনুমতি করেন তা হইলে আমি এখন একাই বৃন্দাবনে যাই। ওখানে বাবুরামবাবু ও সুবোধবাবু আছেন বলরামবাবুর কুঞ্জে থাকিবার জন্য খাইবারও কোন কষ্ট নাই। আমি তাহাদের কাছে থাকিলে কোন কষ্ট হইবে না, এবং এখন দুই এক বৎসর পশ্চিমে একাও থাকিব না।...আপনি ভয় করিবেন না যে ছেলেমানুষ কোথায় যাইবে, হয়তো খুব কষ্ট পাইবে। এখানেই বা কি কম কষ্ট পাইতেছি। এতদিন সহ্য করিলাম, আপনাকে কিছু বলি নাই।...মঠের বারজন আমা অপেক্ষা কম বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছেন। তবে একথা সত্য যে তাঁহাদের সহিত আমার তুলনাই হয় না। মা এখন আপনি যা ভাল বিবেচনা করিবেন তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।"

কালীকৃষ্ণের এই আর্তিতে সাড়া দিলেন মা। লিখলেন, "বাবা জীবন, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার কষ্ট হইতেছে শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-

ধামে যাইয়া ৺গোবিন্দজীউ দর্শন করিতে পারিলেই ভাল। তোমার পিতামাতার সম্মতি লইয়া ৺গোবিন্দজীউ দর্শনে যাইবে।"

'ঠাকুরের প্রতি অচলা ভক্তি হোক' শ্রীমা'র এই আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বৃন্দাবনের পথে কাশী যান ১৭৯৫ সালের ২০ অক্টোবর। সেখান থেকে অযোধ্যা হয়ে আসেন বৃন্দাবনে। স্বামী প্রেমানন্দ তখন বৃন্দাবনের 'কালাবাবুর কুঞ্জে'র বাসিন্দা। কালীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গী হলেন। ডুবে থাকলেন ধ্যান ভজনে।

এরই মধ্যে খবর এল স্বামীজী পাশ্চাত্য বিজয় শেষে ফিরে আসছেন ভারতে। সে খবরে স্বামী প্রেমানন্দ এবং কালীকৃষ্ণের হৃদয় যেন নেচে উঠল। ১৮৯৭ সালের মার্চে তাঁরা ফিরে এলেন মঠে। স্বামীজী ফিরে এসেছেন। কালীকৃষ্ণ তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, 'ওঃ এই ছেলেটি বুঝি।' আর বিবেকানন্দের মধ্যে কালীকৃষ্ণ দেখলেন, "শরীর দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। কি অপরূপ মূর্তি—একাধারে সৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেলা, একটা ননচ্যালাণ্ট ভাব। এ ড্যাজলিং পারসনালিটি। আমার ফার্স্ট ইম্প্রেসন—ভালবাসা, ভক্তি ও ভয় মিশ্রিত ভাব।...তিনি যখন ভিতর বাড়ির ছাদে কৌপীন মাত্র পরে আপনার ভাবে বিভোর হয়ে সিংহের মতো ঘুরে ঘুরে পায়চারি করতেন তখন মনে হ'ত যেন আধ্যাত্মিক জগতের নেপোলিয়ন, তাঁর পদক্ষেপে যেন দুনিয়াটা স্লিপিং ফ্রম আণ্ডার হিজ ফিট, যেন টলমল করছে। মনে হ'ত যেন মহাশক্তির স্ফুরণ অনবরত হচ্ছে ও ফেটে পড়ছে।"

সেই স্ফুরণের ছোঁয়া পেলেন কালীকৃষ্ণ স্বামী বিরজানন্দে রূপায়িত হয়ে, ১৮৯৭ সালের প্রথম দিকে সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এদিকে মঠ উঠে এল বেলুড়ে। ১৮৯৯ সালে স্বামীজী ঢাকায় প্রচার চালাবার জন্য মনোনীত করলেন প্রকাশানন্দ আর বিরজানন্দকে। সেদিন একটু অনিচ্ছার সঙ্গে বিরজানন্দ বলেছিলেন, সাধনভজন কিছুই করলুম না, ভগবানকে এখনও উপলব্ধি করলুম না, আমি কি বক্তৃতা করব ?

স্বামীজী তাঁকে বললেন, তুই তো আচার্যের অভিমান রেখে বলবিনি, সেবার ভাবে যেমন অপর দশটা কাজ করিস, বক্তৃতাও সেইভাবে করবি।

কিন্তু আমি কি জানি যে বলবো ?

আচ্ছা, দাঁড়িয়ে এটাই বলবি যে আমি কিছু জানি না। আমি কিছু জানিনা এটা বলাই তো মস্ত বড় শিক্ষাদান। আমি সব জানি—এ ভাব হচ্ছে অজ্ঞান।

তাহলেও ধ্যান সাধনা না করে—

দেখ নিজের মুক্তি যদি খুঁজিস তো নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্য এই কাজ করিস তো এখনই মুক্ত হয়ে যাবি ?

স্বামীজীর সেই দীপ্ত ভঙ্গিমায় দূর হ'ল বিরজানন্দের দ্বিধা। প্রস্তুত হলেন তিনি ঢাকা যাবার জন্য। যাবার আগে একদিন ঠাকুর ঘরে প্রকাশানন্দ আর বিরজানন্দকে ডেকে নিয়ে স্বামীজী তাঁদের মাথায় হাত রেখে শক্তি সঞ্চার করলেন। বললেন 'বিশ্বাস কর, তাঁর শক্তি তোদের ভিতর দিয়ে সংক্রমিত হয়েছে জানবি সংঘই ঠাকুরের সমষ্টি শরীর।'

সেদিন বিরজানন্দের মধ্যে তিনি শুধু শক্তি সঞ্চারই করেননি—দিয়েছিলেন 'চাপরাশ'ও, দিয়েছিলেন উপযুক্ত প্রার্থীকে মন্ত্র দেবার অধিকার। শিখেয়েছিলেন কাকে কী মন্ত্র দিতে হবে। একদিন যাঁকে সংঘগুরুর আসনে বসতে হবে তাঁকে তখন থেকেই তৈরি করার জন্যই যেন স্বামীজীর এই প্রয়াস। ১৮৯৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁরা গেলেন ঢাকায় প্রচারের জন্য।

কিছুদিন বাদে অন্যকাজে প্রকাশানন্দকে ফেরৎ আনা হলে বিরজানন্দ একাই চালিয়ে যেতে থাকেন প্রচার। ঢাকা—ময়মনসিং—বরিশাল সর্বত্র প্রচারিত হতে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন।

এক সময় শেষ হ'ল প্রচার। বিরজানন্দ ফিরলেন মঠে। ওদিকে স্বামীজীর শরীরও তখন ভেঙে পড়েছে। বিরজানন্দ মঠে ফিরেই হাতে তুলে নিলেন তাঁর সেবার ভার। প্রাণ-ঢালা—ক্লান্তিহীন সে সেবা। তা যেন ছিল তাঁর সেবাযজ্ঞ—ওরই মধ্যে দিয়ে চলছিল তার সাধনা।

শরীর সারাবার জন্য স্বামীজী আবার বিদেশযাত্রী হলেন। তার আগে বিরজানন্দকে কর্মী হিসেবে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। বিরজানন্দ কিন্তু সেদিন সবিনয়ে বলেছিলেন, আপনি যে ক'দিন মঠে আছেন সে ক'দিন অন্ততঃ আমাকে আপনার সেবার অধিকার দিন। আপনি চলে গেলে আমিও চলে যাব মায়াবতী।

শিষ্যের এ আর্তি স্পর্শ করেছিল স্বামীজীর প্রাণ। তিনি রাজী হন। স্বামীজীর বিদেশ যাত্রার পর বিরজানন্দ এলেন মায়াবতীতে। একই সঙ্গে চলল সাধনা এবং আশ্রম থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-কে সবদিক থেকে স্বনির্ভর করার কাজ।

এরপর বিরজানন্দ কনখলে গিয়ে হরিহররাজের সান্নিধ্যে তপস্যা করতে থাকেন। এই সময়ই স্বামী স্বরূপানন্দ নৈনিতালে হঠাৎ দেহত্যাগ করলে বিরজানন্দকে পাঠান হয় অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ করে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ওই আশ্রমের অধ্যক্ষ। তাঁর সুপরিচালনার গুণে আশ্রম হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী এবং 'প্রবুদ্ধ

ভারত'-এর প্রচার বৃদ্ধি পায়। গ্রহণ করেন স্বামী স্বরূপানন্দ পরিকল্পিত পাঁচখণ্ডে স্বামীজীর সমস্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশের কাজ। এর চারখণ্ডের সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেন তিনিই। স্বামীজীর ইংরেজী জীবন গ্রন্থ 'লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ' বাই হিজ ইস্টার্ন এণ্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপলস পড়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁকে লিখেছিলেন, "যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই বৃহদাকার জীবনগুলি বাহির করিতেছ অপর কেহ যে এইরূপ পারিত আমার জানা নাই।" স্বামী অভেদানন্দ স্বামীজীর গ্রন্থগুলি পড়ে লেখেন, "তাঁহার অমূল্য জ্ঞানরত্ন জগৎকে বিলাইয়া বাস্তবিকই জগতকে ধন্য করিতেছ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।—এ একটা মস্ত কাজ হচ্ছে—লেকচার ফেকচারের চেয়ে অনেক উচ্চতর কাজ। ইট ওয়াজ রিজার্ভড ফর ইউ—এ সন্ন্যাসীস উইথ ইনফিনিট পেসেন্স এণ্ড কামনেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আনফ্লিঞ্চিং জিল।"

১৯০৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর হলেন মঠের অন্যতম অছি এবং মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য। নির্জনে তপস্যার জন্য এই সময়ই তিনি হিমালয়ের নিভৃত অরণ্য অঞ্চলে 'শৈলা' বলে পরিচিত একটি জায়গাকে শ্যামলাতাল নামে চিহ্নিত করে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রম। পরে ওই সঙ্গে গড়ে তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। একই সঙ্গে চলে সাধন ভজন এবং স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থের তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড সম্পাদনা ও প্রকাশের কাজ। ১৯১৯ সালে পাঁচ মাস দক্ষিণ ভারতের তীর্থ দর্শন ও সিংহল ভ্রমণ করেন।

১৯২৬ সালের এপ্রিলে মঠ ও মিশনের ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনের পর সংঘ পরিচালনার জন্য প্রবীণ সংঘ পরিচালকদের সহায়তা করতে যে কার্যনির্বাহক কমিটি হয় বিরজানন্দকে করা হয় তার কর্মসচিব। সেসময় সারদানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আমাদের (ঠাকুরের সন্তানদের) পরে সবচেয়ে প্রাচীন, তোমাকেই এই কমিটির সেক্রেটারি হতে হবে।"

১৯২৯ সালে মঠ ও মিশনের সম্পর্কে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পাশে থেকে তিনি বেশ কিছু সমস্যা মেটাতে সাহায্য করেন। এই সময় উদ্বোধন মঠ ও নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বও নিতে হয় তাঁকে। ১৯৩০ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অসুস্থ হলে এক বছরের জন্য সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাঁকেই।

১৯৩৪ সালে তিনি হন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৩৮ সালে হন সহকারী অধ্যক্ষ। ওই বছরই ২৩ অক্টোবর স্বামী শ্রদ্ধানন্দের তিরোভাবের পর হন মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ। ১২ বছর তিনি ছিলেন মঠের অধ্যক্ষ। অসংখ্য তাপিত মানুষের মন প্রাণ করেছেন শীতল কিন্তু গুরুর অভিমান কখনও স্পর্শ করেনি

তাঁকে। তিনি বলতেন, "আসল গুরু সচ্চিদানন্দ। তিনি অন্তরে রয়েছেন। তিনি শুভবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে সাধককে শ্রেয়ের পথে সর্বদা চালিত করছেন। তিনি শুভবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে সাধককে যখন যেটি দরকার করিয়ে নেন। গুরুর এই আসল স্বরূপ সর্বদাই শিষ্যের মধ্যে আছেন। গুরুর স্থূলদেহে অবসানের পর এর অভাব হয় না।"

সংঘাধ্যক্ষ হবার পরই বিরজানন্দ হৃদ ও যকৃতের রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু তাতেও কর্মপ্রবাহে পড়েনি এতটুকু ভাঁটা। ওই সময়ই বিশ্বাস, আমার প্রিয়তম আচার্যের জাগ্রত ভারতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবেই। বেলুড়ে গঙ্গাতীরে স্বামীজি পরিকল্পিত এই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের কথা কয়েক বছর আগেও কেউ কি ভাবতে পেরেছিল। মিশন আজ তো সেখানে আবাসিক বিদ্যামন্দির প্রাতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে—সম্ভবত দ্রষ্টা আচার্যের ভাবদৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়েরই কেন্দ্ররূপ।'

সংঘকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমষ্টি বিগ্রহ বিশেষে দেখতেন। বহু শাখান্বিত সুবিস্তৃত এই সংঘের মূল শ্রীরামকৃষ্ণ-এর সমস্ত প্রাণরস ওই মূল থেকে সঞ্চারিত—তাতে সঞ্জীবিত। এ সংঘ উর্ধ্বমূল অধঃশাখা একটি বৃক্ষ—এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

১৯৫৪ সালে শ্রীমা'র জন্মশতবৎসরে দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজী পরিকল্পিত যে শ্রীসারদা মঠ' স্থাপিত হয় তার পেছনেও ছিল স্বামী বিরজানন্দেরই অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ।

সংঘ গুরু হিসেবে তিনি নানা জনকে দেখিয়েছেন পথ। বলেছেন, "সংসার ত্যাগ করতে হলে যে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতে হয় তা নয়। আসল ত্যাগ হচ্ছে মনে। মনে ত্যাগ করলে সংসারেই থাক আর বনেই থাক, একই কথা। মনে ত্যাগ না করে বনে গেলেও সংসার সঙ্গে সঙ্গে যাবে ও ভোগাবে, নিস্তার পাবে না।" ওইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি 'সংসারের সব সুখটুকুও চাই আবার ভগবানকেও পেতে চাই, তা হয় না গো হয় না।' তাঁর কথা, 'যে তাঁকে চায় সে তাঁকে পায়; যে তাঁকে না চায় তাকে পায় ভূতে নাচায়।'

অনায়াসে সব কিছু পাবার নীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী, যাঁরা মনে করেন, অন্যে তাঁদের হয়ে সব করে দেবে তাঁদের তিনি বলেছেন, "জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম নিজে অর্জন করতে হয় খুব খাটতে হয়, নিজস্ব হয়, স্থায়ী হয়, মন ভরপুর হয়ে থাকে। কেউ ডেকে এসে দিতে পারে না। সাধন চাই, তবে সিদ্ধিলাভ হয়। যেমন সাধন তেমন সিদ্ধি।"

সাধারণ মানুষকে তিনি বলেছেন, 'সংসারটাকে যেন একটা দীর্ঘ স্বপ্ন বলে জানবে যতক্ষণ আছে, ব্যবহারিকভাবে সত্য জেনে নিজের কর্তব্য করে যাও।' আর মুক্তিকামী মানুষকে তিনি বলেছেন, 'সর্বদা সজাগ থাকবে। নিজের মনকে কখনও বিশ্বাস করবে

। হাজার উচ্চ অবস্থা লাভ করলেও নিজেকে জিতেন্দ্রিয় মনে করবে না, কারণ নও পতন হতে পারে। পাপ সূক্ষ্ম ভাবে কখনও ধর্মের রূপ ধরে, কখনও দয়ার রূপ র, কখনও বন্ধুর রূপ ধরে তোমায় ভুলিয়ে বশ করবার চেষ্টা করবে। কখনও নিজেকে রিয়ে ফেলবে, বুঝতে পারবে না। যখন বুঝতে পারবে, তখন হয়ত ফেরা অসাধ্য ব।' ওই সঙ্গেই সতর্ক করে বলেছেন, 'যেখানে কেউই কারো নয়, এমন কি পনি আপনার নয়, তাকেই সংসার বলে।'

তার কথা, ধর্মকে সকলেই বেওয়ারিশ মাল মনে করে। শাস্ত্রাদি চর্চা না করে, ধন ভজন কিছু না করে ধর্মবিষয়ে মত বা বিধান দিতে সকলেই অগ্রসর হয়, নিজেকে ক্সপার্ট বা সবজান্তা মনে করে। যে কোন অপরবিদ্যা আয়ত্ত করতে হলে কত সর ধরে বিদ্বান শিক্ষকের কাছে শিখতে হয়, আর পরবিদ্যা লাভ করতে, ধর্মের ক্ষাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব জীবনে প্রতিফলিত করতে বহু আয়াসসাধ্য শিক্ষা-দীক্ষার দরকার না মনে করা বাতুলতা মাত্র।'

যোগ ও কর্মমার্গের পথিক স্বামী বিরজানন্দ চিরটাকাল শ্রীরামকৃষ্ণ আর গুরু বেকানন্দকে সামনে রেখে করে গেছেন কাজ এবং সে কাজের শেষে ১৯৫১ সালের ০ মে শ্রীমা'র চিহ্নিত সন্তান মহাসমাধি যোগে লীন হয়ে যান শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে।

স্বামী শঙ্করানন্দ

স্থাপক-রূপ-তত্ত্বকং যুগে যুগে চ দর্শিতং ।।
তং নমামি দেব-দেব-রামকৃষ্ণমীশ্বরম্ ।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, মোস্ট এগ্রেয়েবল কম্পেনিয়ন
মধুর এই প্রীতিভঙ্গ।

লিউ আইরেস তার 'আলটার্স অব দি ইষ্ট'-এ লিখেছেন, 'আমার এই জীবনে ও মিশনের সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দের চেয়ে ভদ্র, সহৃদয়, কোন ব্যক্তিত্বের মুখোমু হয়েছি বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

দূর থেকে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ যেতে গিয়েও একবার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন আপাঙ্গে অবলোকন করেছিলেন ওই বলিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকটিকে।

প্রথম দর্শনেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর হাতখানি ধরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ হবে।' মহাকবি গিরিশচন্দ্রও সেদিন বলেছিলেন প্রায় একই কথা—'দেখ, তোমার হবে। তোমার হবে আমি বলছি হবে।'

এই যে ব্যক্তিত্ব, যাঁর সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা গিরিশ ঘোষের এত প্রত্যাশা—যাকে দেখেই স্বামী বিবেকানন্দ চিহ্নিত করেছিলেন ভবিষ্যতের জন্য তিনি আর কেউ নন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্যদের পর তিনিই প্রথম—যিনি হলেন মঠ ও মিশনের সভাপতি

এক সুবিশাল প্রীতিপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারি, সহজ সরল অথচ কর্তব্যনিষ্ঠ আজীবন তপস্বী এই মানুষটি ছিলেন চিরবৈরাগী। তার সে বৈরাগ্যের প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর সেই বাল্যজীবন থেকেই। একসময় হিন্দু কলেজ হোস্টেলের ২৭ নম্বর ঘরে বিপ্লবী মাখন সেনের সঙ্গে তিনি প্রায়সঃ আসতেন। দেশের মুক্তিযজ্ঞে ঋত্বিক হবার কথা এসময় মাঝে মাঝে স্ফুরিত হ'ত তাঁর অধর থেকে। কিন্তু বৈরাগ্যের আবরণে তা ঢাকা মাখন সেন সেইসময়কার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'তখনই আমরা দেখেছি ওর কথা বার্তা আর পাঁচজনের মত নয়। প্রায়ই বলত গৃহত্যাগ করে সাধু হয়ে যাবে।'

তাঁর সাধু হবার ওই বাসনা যে নেহাতই আবেগ নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯০২ সালের অক্টোবরে। কালীপুজোর সেই দিনটাতে সব ছেড়ে চান করবার নাম করে তিনি চলে আসেন মঠে। শুরু হয় তাঁর আরেকজীবন।

ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর গোড়া থেকেই। তিনি ছিলেন সেজমামা শরৎচন্দ্র গুপ্তের খুব ভক্ত। সেজমামা ছিলেন হাতরাস স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। পরিব্রাজনের কালে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন নামলেন হাতরাসে। নিঃসঙ্গ স্বামীজীকে কি না কি ভেবে শরৎ গুপ্ত দিলেন আশ্রয় -কিন্তু পরে দেখা গেল সব ছেড়ে ছুড়ে তিনিই আশ্রয় নিয়েছেন স্বামীজীর কাছে। পুরণো পরিচয় মুছে হয়েছেন স্বামী সদানন্দ। এ ঘটনাটা বালক অমূল্যের মনকে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল।

স্বা। শঙ্করানন্দকে তাঁর সেজমামা অমূল্য বলেই ডাকতেন আর ওই নামেই তিনি ছিলেন বেশি পরিচিত। তার প্রকৃতনাম ছিল অমৃতলাল সেনগুপ্ত। ১৮৮০ সালের মার্চ মঙ্গলবার শিবচতুর্দশীর রাতে হুগলীর গোপাল গুপ্ত লেনে মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম। বাবা নবীনকৃষ্ণ সেনগুপ্ত ছিলেন তখনকার দিনের এক নামকরা ইঞ্জিনিয়ার। সত্য আর কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যই তাকে সরকারি চাকরি ছাড়তে হয়েছিল। পিতার এই চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রকাশ পেয়েছিল পুত্রের মধ্যেও।

বাড়ি ছিল ২৪ পরগণার বামুনমুড়া গ্রামে। কিন্তু সরকারি চাকরি ছেড়ে নবীন কৃষ্ণের মুর্শিদাবাদের নবাব স্টেটের ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি নেওয়ায় কাজের তাগিদে তাঁকে প্রায়ই ঘুরতে হয় এখানে সেখানে। তাই ছেলেমেয়েদের তিনি তাদের মামার বাড়িতে রেখেই পড়াশোনা করানোর ব্যবস্থা করেন। মা সত্যবতীও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। মা'র চরিত্রের সেই বিশেষ প্রভাব অমূল্যকে করেছিল ধর্মমুখী।

তার ছোটবোনের জন্মের সময়ই মা'র মৃত্যু হয়। অত অল্প বয়সে মা'কে হারিয়ে অমূল্য যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন। জীবন মৃত্যু সম্পর্কে ওই ছোট বয়সেই তাঁর মনে দেখা দিল নানা জিজ্ঞাসা। এরই মধ্যে হুগলী নর্মাল স্কুলে চলল শিক্ষার প্রথম উদ্যোগ। সেখান থেকে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। কী হুগলী, কী কলকাতা সবজায়গাতেই তার প্রখর স্মৃতিশক্তি শিক্ষকদের করেছে মুগ্ধ। নির্ভীক, গম্ভীর প্রকৃতির এই ছেলেটিকে তাঁরা খুবই ভালবাসতেন। হুগলী থেকে এসে তিনি ভর্তি হন ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে। ওই সময় বিদ্যালয়ের সামনে লাহাদের বাড়িতে প্রতি রবিবার যে গানের ক্লাস হ'ত তিনি তাহাতে যোগ দিতেন। সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ওখান থেকেই দেখা দেয়।

কলকাতায় তিনি থাকতেন মামাদের শান্তি ঘোষ স্ট্রীট অথবা বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে। ব্রাহ্মস্কুল ছেড়ে সারদা চরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশন এবং সিটি

কলেজিয়েট স্কুলেও তিনি কিছুদিন পড়াশোনা করেন। যে কোন কারণেই হো‍ মামার বাড়িতে থেকে অমূল্যর পড়াশোনাটি তেমন ভাবে এগোয় না। ছেলে পড়াশোনার ওই ব্যাঘাত দেখে বাবা নবীনকৃষ্ণ তাকে নিজের কাছে এনে মুর্শিদাবা স্কুলে ভর্তি করে দেন। তিনি সে সময় ক্লাস নাইনে পড়তেন। ঐ স্কুল থেকেই তি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে দু' বছর পড়েন।

পড়াশোনার সঙ্গে নানা ধরনের লেখাধুলাতেও তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস বা জিমন্যাস্টিক সবটাতেই তি ছিলেন প্রথম সারির। আসলে ফাঁকি জিনিসটাই ছিল তাঁর চরিত্রে অনুপস্থিত যখন যে কাজে হাত দিতেন তাই করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। যখন সাঁতার শিখলে তখন গঙ্গা পারাপার করে তবে তিনি শান্তি পেতেন। সেই ছোটবেলা থেকে শরীরটাকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন রীতিমত মজবুত। বার্ধক্যে শরীরের ভাঙ ধরলে তিনি বলেছিলেন, 'পা এমন ফুলো হয়েছে যে চলতে কষ্ট হয়। আগে এ জোর ছিল যে ৩৫ সের ওজনের বারবেল এক পায়ে রেখে ব্যালেন্স করে উপ তুলে ফেলতে পারতুম। এখন একবারে চেপসে গেছি। বর্ষায় এই মঠের ঘা থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতুম।'

এই ঝাঁপ দিতে গিয়েই কিন্তু ঘটেছিল বিপত্তি। তিনি তখন বহরমপু কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়েন। ওই সময় একদিন মাথায় চাপল মুর্শিদাবাদে গঙ্গা কত গভীর তা পরীক্ষা করার বাসনা। সোজা ডাইভ দিলেন গঙ্গায়। নিচে ছি একটা বড় পাথরের চাঙর। মাথা সোজা এসে লাগল তাতে। রক্তে ভে গেল। অজ্ঞান অবস্থায় তোলা হ'ল তাঁকে। জ্ঞান ফিরল কিন্তু মাঝে মাঝে মাথায় দেখা দিত প্রচণ্ড যন্ত্রণা। সে সময় চেতনা না হারানো পর্যন্ত তিনি কো স্বস্তি পেতেন না। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কোন ফল হ'ল না অবশেষে কবিরাজী করে তাঁর এই রোগ সারে। মাথার এই আঘাতের জন্য তি বহরমপুর থেকে সে বছর এফ, এ পরীক্ষা দিতে পারলেন না। পরের বছর কলকাতা জেনারেল অ্যাসেম্বলী থেকে এফ এ পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কি থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ই তাতে ইতি দেন।

নির্ভীকতা এবং বেপরোয়া ভাব ছিল অমূল্যের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। উপস্থি বুদ্ধিতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। শুধু যৌবন নয়, এই নির্ভীকতা ছিল তাঁ আজীবনের সঙ্গী। বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল বসাতে যখন মিস্ত্রিরা

সাহস করছে না, সে সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি মন্দিরের চুড়োয় উঠে সেই ত্রিশূল বসান।

জীবনের একবারে শেষ দিকে নানা ব্যাধিতে তিনি যখন প্রায় পঙ্গু তখন শোনাতেন তাঁর জীবনের সে সব কাহিনী। বলতেন, 'এই শরীর দেখছিস—একবারে জবুথবু। এক সময় শরীরে অসীম শক্তি ছিল। কী মজবুত শক্ত চেহারা। বন্ধুরা যত ইচ্ছা কিল ঘুষি মারত কিছুতেই দমে যেতাম না। দু'চার ঘণ্টা একসময় সাঁতার কাটতুম। পর পর দুটো ফুটবল ম্যাচ একসঙ্গে খেলেছি। এই যে গংগা দেখা যাচ্ছে—এতে সাঁতার কাটা আমার অভ্যাস ছিল। এক নাগারে যাতায়াতে বার বার ত হবেই সাঁতার কেটে গঙ্গা পেরিয়েছি।' তিনি বলতেন, তাঁর হাত পা, কান চোখ বুঝি এমন খেলত যে নিমিষের মধ্যে তিনি তৎপর হয়ে উঠতেন। সেই সব তৎপরতার কাহিনী শোনাতে গিয়ে বলেছেন, একবার রাজা মহারাজের দাড়ি কামানোর সময় হাত ফসকে ক্ষুরটা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এহাত ওহাতে লোফালুফি করতে করতে ক্ষুরটি ধরে ফেললেন। তাঁর সেই তৎপরতা দেখে রাজা মহারাজ একটু হেসে শুধু বলেছিলেন, বাঃ! বাঃ! যেন জাগলার! একইভাবে ঝাড়লণ্ঠন থেকে পড়ে যাওয়া কাঁচের চিমনিকে তিনি পা দিয়ে লুফে ভাঙার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এতে এক ধরণের তৎপরতা। আরেক ধরনের তৎপরতায় জীবন পর্যন্ত রক্ষা করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "এক রাতে ১১ টায় কানে একটা অস্পষ্ট শব্দ এল—বাঁচাও, বাঁচাও'। আমি তখন লেগেট হাউসে থাকি। মঠ বাড়িতে এসে দেখলাম ভরত ও আর কে কে গল্প করছে। মাঝ গঙ্গায় মনে হ'ল নৌকাডুবি হয়েছে। 'বাঁচাও, বাঁচাও' শব্দ আমার কানে এল। ভরা গঙ্গা আমার কথা শুনে ভরত আরও কাকে সঙ্গে নিয়ে ওদিককার ঘাট থেকে নৌকা আনিয়ে চেপে মাঝ গঙ্গায় গেল। ভরত যখন ফিরে এল দেখলাম—দু'টো লোককে তুলে এনেছে, আর উল্টে যাওয়া নৌকাটকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে এসেছে। ভরত বললে, আমি না শুনলে, ও লোক দু'টোর প্রাণ বাঁচত না, নৌকাটিও উদ্ধার হ'ত না।'

বেলুড় মঠে মামা স্বামী সদানন্দ যখন তাঁকে নিয়ে আসেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে তখনও স্বামীজী তাঁকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছিলেন একথা আমরা আগেই বলেছি। স্বামীজীর সম্পর্কে বিশেষ টান থাকা সত্ত্বেও অমূল্যের কিন্তু স্বামীজী নরদেহে থাকা অবস্থায় সংসার ত্যাগ করা হয়নি। স্বামীজীর দেহাবসানের মাস তিন চার বাদে তিনি মঠে আসেন। কিন্তু স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের স্মৃতির ছবিটিকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে আজীবন করে যেতেন তাঁর পূজা।

স্বামী শঙ্করানন্দের নিজের ভাষায় স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের সেই ছবি—"প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। মালসাভোগ। গ্রহীতাদের মধ্যে হৈ চৈ ঠেলাঠেলি। বিতরণকারীরা নীরবে কাজ করে চলেছেন। আমি হাত বাড়িয়ে একটা মালসা নিলাম, বন্ধুকেও বললাম। মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক পরিহিত একজন সন্ন্যাসী ধীর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই মন গিয়ে তা'তে লিপ্ত হ'ল।······জ্বলজ্বলে বড় বড় চোখ। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম—ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। সারা দুনিয়া দুমড়ে ফেলেছেন। ভারতের পাহাড় পর্বত, রাজারাজড়ার প্রাসাদ, গরীবের কুড়ে—সর্বত্র পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন, সব অবস্থার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছেন। ছাড়তে বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা দেখেছি, কিন্তু এরকম শান্ত সৌম্য ঋষির মত কান্তি আর কখন দেখিনি। এই প্রথম বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম।"

এর পর বেলুড়ে দাঁযেদের ঠাকুরবাড়িতে তিনি আরেকবার বিবেকানন্দকে দেখেন, প্রণাম করেন। ১৮৯৮ সালে আবার ঠাকুরের মহোৎসব দেখতে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর নিজের কথায়, "উৎসব দেখা আমার উদ্দেশ্য নয়, বিবেকানন্দকে দেখব, বুঝব, তাঁর দুর্লভ সঙ্গলাভ করব। পরবর্তী জীবনে এই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা, আশীর্বাদ আমার জীবনকে সার্থক করেছে। আমি ত্যাগের মহিমা, জ্বলন্ত আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করতে শিখেছি। এই ক্ষণিকের স্পর্শ, মুহূর্তের আলাপ আমার জীবনে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।" তিনি বলেছেন, "তাঁর বই পড়ে, সংবাদ পত্রে তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা পড়ে ততটা মজিনি, যতটা তাঁকে চোখে দেখে স্বামীজীকে দেখে নতুন চোখ খুলে গেল। সে চোখে ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, আশপাশের গরীব গুরুচোরা নূতন করে দেখা দিল। আত্মীয়দের প্রতি, দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি বেড়ে গেল নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ক'মে গেল, অপরের স্বার্থ নিজের কাজে বড় হয়ে ফুটে উঠল।"

১৯০২ সালের অক্টোবর। কালীপূজোর দিন। অমূল্য শান্তি ঘোষ স্ট্রীটে মামাবাড়ি থেকে কাঁধে গামছা ফেলে গেলেন গঙ্গায় চান করতে। সেই গেলেন তো গেলেন। আর ফিরলেন না। বাড়ির সবাই ভাবল অমূল্য বুঝি গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে। ওদিকে তিনি গঙ্গা পার হয়ে সালকিয়া ঘাটে পৌছে হেঁটেই রওনা হলেন উত্তরপাড়া। বেলুড় মঠে যেতে গিয়েও ভাবলেন, আত্মীয়স্বজনরা হয়ত ধরে ফেলবেন। তাই উত্তরপাড়া থেকে গেলেন পাণ্ডুয়া। সেখান থেকে বর্ধমান হয়ে বোলপুর। বোলপুর থেকে বেশি কিছু ভেতরে ইসলামবাড়ি বলে এক গ্রামে থাকত অমূল্যর এক বন্ধু। সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি। এ সম্পর্কে পরে একদিন বলেছিলেন, 'হুস করে যারা ছাড়ে তারাই ছাড়তে পারে, একটু একটু করে হয় না।'

দিন কাটে। মন স্থির হয়। ততদিন আশ্রম স্বজনদেরও অমূল্যর মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত। একবারে প্রায় বছর শেষের মুখে অমূল্য এলেন মঠে। মঠে সেই সময়ও সবাই স্বামীজীর বিয়োগব্যাথাকে মন থেকে সরাতে পারেননি।

স্বামী শঙ্করানন্দ লিখেছেন, "৪ঠা জুলাই স্বামীজীর শরীর গেছে। কিন্তু তখনও শোকের ছায়া সারা মঠময়। স্বামীজীর বিয়োগ জনিত দুঃখ সকলের হৃদয় ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা একবারে নাই বললেই হয়, যে যার কাজ শেষ করে ধ্যান জপে ডুবে যেতেন। বিশেষ করে তাঁর গুরু ভাইরা। রাজা মহারাজ বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর কথা উঠলেই কেঁদে ফেলতেন। তখন আমি বেশী ধ্যানজপ করতে পারতাম না। কাজকর্মে বেশ পটু ছিলুম।"

সম্ভবত এই কর্মপটুতার গুণেই ডিসেম্বর মাসেই তাকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সে যাত্রায় তিনি সঙ্গী হন স্বামী সদানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার।

ওই সময় শশী মহারাজ রামানুজের এক জীবন চরিত লিখছিলেন। উপাদান সংগ্রহের জন্য তেলুগু হরফে লেখা একটি সংস্কৃত বই-এর তার দরকার পড়ল। কিন্তু তেলুগু না জানায় সে বইয়ের পাঠোদ্ধার করা মুশকিল হ'ল। শশী মহারাজের নির্দেশে অমূল্য ব্রহ্মচারী সে সময় অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তেলুগু শিখে শশীমহারাজকে সে বই পড়ে শোনান।

১৯০৩ সালে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে অমূল্য ব্রহ্মচারী গেলেন জাপানে, সেখান থেকে চীন হয়ে তারা ভারতে ফিরলেন। পরের বছর জানুয়ারীতে নিবেদিতা এবং স্বামী সদানন্দের সঙ্গে তিনি গেলেন রাজগীর বুদ্ধগয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। সেখান থেকে জানুয়ারীর শেষে ফিরলেন কলকাতায়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবের পরই টাইফয়েডে পড়লেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁর সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন ব্রহ্মচারী অমূল্য। প্রাণঢালা অকৃত্রিম সে সেবায় অভিভূত ব্রহ্মানন্দ বললেন, আমি তোকে সন্ন্যাস দেবো। সে আশ্বাসে প্রাণভরে উঠল অমূল্য ব্রহ্মচারীর।

অবশেষে এল সেই শুভ মুহূর্ত। ১৯০৬ সালে ঠাকুরের তিথিপূজার দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠে সন্ন্যাস দিলেন অমূল্য ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী ও যোগীন ব্রহ্মচারীকে। একইদিনে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করা হয় আরো দু'জনকে। স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর এই প্রথম বেলুড় মঠে জ্বলে উঠল বিরজা হোমের আগুন। সেই আগুনের সামনে সন্ন্যাস দিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাবগম্ভীর অমূল্য ব্রহ্মচারীর নতুন নাম রাখলেন স্বামী শঙ্করানন্দ।

ওই বছরের পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে যে ভয়াবহ বন্যা হয় তাতে সেবাকাজ চালানোর জন্য স্বামী শঙ্করানন্দ ও অন্য একজনকে পাঠান হয়। স্বামী সদানন্দ ভাগলপুরে প্লেগের সময় শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে মহান আদর্শে অমূল্য ব্রহ্মচারীকে উদ্বোধিত করেছিলেন তারই আরেক প্রকাশ ঘটনা পূর্ববঙ্গের এই বন্যাত্রাণে।

স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা থেকে কলকাতায় এসেছেন। স্বামী শঙ্করানন্দকে তাঁর ভারি পছন্দ। যেখানে যান সেখানেই তাঁকে নিয়ে যান। ১৯০৬ সালের শেষাশেষি আবার আমেরিকায় ফিরে গেলেন তিনি। এ যাত্রায় শঙ্করানন্দকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। শঙ্করানন্দের মানসিক ইচ্ছা কিন্তু তা নয়। তাছাড়া শঙ্করানন্দ আমেরিকায় যাক এটা স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও তেমন ইচ্ছা নয়। তাই স্বামী পরমানন্দকে আমেরিকায় নিয়ে গেলেন তিনি। নিয়ে গেলেন কিন্তু খুব খুশি মনে নয়। আসলে তিনি চাইছেন অথচ শঙ্করানন্দ যাচ্ছেন না এটাই ছিল স্বামী অভেদানন্দের ক্ষোভের কারণ।

যাই হোক, স্বামী অভেদানন্দকে আমেরিকার জাহাজে তুলে দেবার জন্য স্বামী শঙ্করানন্দকে বোম্বাইতে পাঠান হ'ল।

সেখানে অভোদানন্দ জেদ ধরলেন শঙ্করানন্দকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। বললেন তুমিও চল আমার সঙ্গে।

ধীরকণ্ঠে শঙ্করানন্দ বললেন—না তা হয় না।

কেন ?

রাজা মহারাজ যেমন বললেন, আমি তার এদিক ওদিক করতে পারিনা। তিনি আপনাকে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে বলেছেন।

আমিও তো তোমার গুরুজন, তবে আমার কথা শুনবে না কেন ?

হ্যাঁ আপনার কথাও শুনবো। এখন কথা মেনে চলছি, অতএব আমার তাই করা উচিত। পরে আপনার আদেশ মেনে চলব। স্বামী শঙ্করানন্দের সে জবাব তেমন খুশি করতে পারল না অভেদানন্দকে। কিছুটা ক্ষুন্ন মনেই তিনি ফিরে গেলেন আমেরিকায়।

স্বামী শঙ্করানন্দ ছিলেন গুরুগত প্রাণ। গুরুর ইচ্ছাতেই তিনি চলতেন। নিজের আলাদা কোন ইচ্ছা বলে অবশিষ্ট রাখেন নি। রাখেননি বলেই আমেরিকা যাবার প্রলোভন এমন হেলায় ত্যাগ করেছেন তিনি। শুধু এই একবার নয়, আরেক বারও প্রচারের জন্য শঙ্করানন্দকে আমেরিকায় পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। এমন কি পাসপোর্টও যোগাড় হয়। কিন্তু যাবার আগে যখন জানা গেল, প্লেগ এবং টাইফয়েডের ইনজেক্সন নিতে হবে তখনই তিনি বললেন, না, ইনজেক্সন আমি নেবো না।

ইনজেকসন নেওয়ার সার্টিফিকেট না দেখালে যেতে দেবে না বলায় বেশ দরাজ গলায় বললেন, তাহলে আমিই যাবো না।

সে কি? ইনজেকসন নিতে এত ভয় কেন? একজন জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে। একটু হেসে নিজের মজবুত চেহারাটা দেখিয়ে বললেন, ভয় নয় নিষেধ।

নিষেধ?

হ্যাঁ, গুরুর নিষেধ। জানোতো একবার আমার খুব অসুখ করেছিল। কিছুতেই আর সারে না। সবাই ভয় পেয়ে ডাঃ কাঞ্জিলালকে নিয়ে এলেন। তিনি দেখেশুনে বললেন, মিল্ক ইনজেকসন নেওয়া দরকার! কথাটা শুনেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেদিন আমাকে বলেছিলেন, ঐ পথে যেও না। গুরুর সে নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারব না।

সত্যিই তিনি আমেরিকা গেলেন না।

সব কাজে সব সময় তিনি মর্যাদা দিতেন গুরুকে, জীবন দিয়েও পালন করতেন তাঁর নির্দেশ। পরবর্তী কালে যখন তাঁর জীবন সংশয় হয় তখনও তিনি ইনজেকসন নেননি। কঠিন ব্যাধিতে যন্ত্রনার লাঘব করতেও তিনি ইনজেকসন নিতে রাজি হননি।

যাই হোক, সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল ত্রাণ ও সেবা কার্য। ১৯০৯ সাল নাগাদ মেদিনীপুর জলপ্লাবিত হলে শঙ্করানন্দ দীর্ঘদিন সেখানে থেকে সেবাকাজ চালান। শুধু সেবা কাজ নয়, কি কারণে এই প্লাবন—কি করেই বা এই জায়গাকে বার্ষিক প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তা নিয়েও তিনি ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন। ময়না অঞ্চলকে প্লাবন থেকে রক্ষা করার একটা পরিকল্পনা এবং সে কাজের খসড়াও তিনি সরকারের কাছে পেশ করেন। সরকার সেটি ভালভাবে বিচারবিবেচনা করে তা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওই কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত অফিসার উইলিয়াম কক্স দেশে চলে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত সে পরিকল্পনা আর রূপায়িত হয়নি।

যাইহোক সে সময় স্বামী শঙ্করানন্দ এবং মিশনের অন্যান্যদের সেবাকাজ দেখে, মেদিনীপুব জেলাশাসক মিঃ লিয়ানতো মিশনের সন্ন্যাসীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

এরপর ১৯১৪ সালে মেদিনীপুরের ভগবানপুর এবং মগরা অঞ্চলে ব্যাপক খরার ফলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেখানে সেবাকাজের জন্যও স্বামী শঙ্করানন্দের নেতৃত্বে মঠ ও মিশনের এক কর্মীদল সেবাকাজ চালায়। তাঁদের প্রাণ ঢালা কাজ আর পরিশ্রম দেখে বৃটিশ সরকারের মিশন সম্পর্কে ধারণা বেশ বদলে যায়। মঠ থেকে বিপ্লবীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এমন অভিযোগে তাঁরা মিশনের সন্ন্যাসীদের বেশ বিষ নজরেই দেখতেন। কিন্তু তাঁদের এই সব সেবা কাজ দেখে তাঁরা আর বিদ্বেষ পুষে রাখতে পারলেন না। সে

সময়কার কথা উল্লেখ করে স্বামী শঙ্করানন্দ বলেছেন, "সেবারের রিলিফে মিশনের খুব নাম হ'ল। প্রকাশ্য সভায় ম্যাজিসস্ট্রেট রামকৃষ্ণ মিশনের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তখন অগ্নিময় স্বদেশী যুগ। কত বিপ্লবী স্বদেশী তা ছেড়ে ছুড়ে আমাদের মঠ মিশনে যোগ দিয়েছে। বৃটিশ অত্যন্ত ভীতির চোখে তাদের দেখত। তারা হিংসা ছেড়ে, অহিংসার ক্ষেত্রে, ত্যাগের পথে ঝাঁপিয়ে পড়লেও বৃটিশ তাদের খোঁজ খবর প্রায়ই নিত এবং সন্দেহের চোখে দেখত। ঐ দুর্ভিক্ষ রিলিফের পর সাহেবদের ধারণা বদলে গেল। তারা এবার রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সুনজরে দেখতে আরম্ভ করল এবং পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করল। প্রত্যেক কাজে বেরুবার আগে ঠাকুর ও রাজা মহারাজকে স্মরণ করে বেরুণই আমার মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।'

শঙ্করানন্দের এই গুরুভক্তি এবং গুরুসেবা আশ্রমের সবারই শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। ১৯০৯ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুরী গেলেন। সেই সময় থেকে প্রায় এগার বছর স্বামী শঙ্করানন্দই ছিলেন ব্যক্তিগত সচিব। সে সময় মঠের প্রতিটি কাজে গুরুকে সাহায্য করতেন তিনি। স্বামী ব্রহ্মানন্দও অমূল্য মহারাজের একনিষ্ঠ সেবায় খুবই সন্তুষ্ট হন। শিষ্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা ও গভীর ভালোবাসা। আর গুরুদেবই ছিল শিষ্যের আরাধ্য দেবতা। পুরী, ভুবনেশ্বর, কাশী, ঢাকা, ময়মনসিং, কামাখ্যা প্রভৃতি প্রতিটি জায়গায় তিনি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে। ১৯১৬ সালে প্রায় ন' মাস দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করে ১৯১৭ সালের মে মাসে তাঁরা পুরীতে আসেন ওই সময় গুপ্তকাশী ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য অনুভব করে। ওইখানেই একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করতে চান। গুরুদেবের স্বপ্নকে বাস্তব করার দায়িত্ব পড়ে শঙ্করানন্দের ওপর।

শ্রীশ্রীমা'র মহাপ্রয়াণের পর তাঁর সমাধিস্থানে মাতৃমন্দির গড়ে তোলার দায়িত্বও নেন তিনি। ১৯২২ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহাবসানের পর তাঁর মরদেহ বেলুড় মঠে আনা হলে স্বামী সারদানন্দের নির্দেশে শঙ্করানন্দই তাঁর গুরুর সমাধি স্থান পছন্দ করেন এবং সেখানে ব্রহ্মানন্দ মন্দির গঠনের দায়িত্বও দেওয়া হ'ল তাঁকে। একই ভাবে জয়রামবাটির মাতৃমন্দির, বেলুড়ে স্বামীজীর মন্দিরের দোতলা, মঠের অতিথি ভবন এবং 'গিরিশ মেমোরিয়াল' তাঁরই সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। স্বামী বিরজানন্দের নির্দেশে ১৯৪২ সালে বেলুড়ে স্বামীজীর মন্দিরের সামনের পোস্তা বাঁধানোর দায়িত্বও নেন তিনি। তাঁরই পরামর্শে চলে পুরো মঠের কাজ।

মঠের এই সব উন্নয়ন কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর নানা তীর্থ ভ্রমণ। তীর্থ ভ্রমণের সময় কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলে মনে করতেন না।

১৯২৪ সালে স্বামী বোধানন্দের সঙ্গে রেঙ্গুনে যান সেখানকার আশ্রম পরিদর্শনে। সেবার তিনি সেখানে যে বক্তৃতাটি দেন তা হয় অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী।

দায়িত্বনিষ্ঠ তীক্ষ্ণবুদ্ধি শঙ্করানন্দ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মঠের বিভিন্ন বৈষয়িক সমস্যার সমাধান করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম এবং বাগবাজার উদ্বোধন অফিসের গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব তিনি বহন করেন। ১৯১০ সালে তিনি হন মঠের কনিষ্ঠতম ট্রাস্টি এবং মিশনের প্রথম পরিচালক সমিতির সদস্য। স্বামী সারদানন্দের উইলের দুই এক্সিকিউটরের অন্যতম ছিলেন তিনি। মাঝখানে কিছুদিন ছিলেন ভুবনেশ্বর মঠ ও দিল্লি মিশন কেন্দ্রের সভাপতি। ১৯২৯ সালে তিনি হন রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক, ১৯৩৮ সালে কোষাধ্যক্ষ এবং ১৯৪৭ সালে সহ সভাপতি হন।

১৯৫১ সালের ৩০ মে স্বামী বিরজানন্দের তিরোধানের পর ১৯ জুন তিনি হন মঠ ও মিশনের সপ্তম সভাপতি। ঠাকুর ও বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্যদের পর তিনিই প্রথম ওই পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসেবে এক দশকেরও বেশি সময় সুদক্ষ ভাবে মঠ ও মিশন পরিচালনা করেন।

তাঁর সময়েই মঠ ও মিশন আরো সম্প্রসারিত হয়। শ্রীমা'র শতবার্ষিক জন্মতিথিতে কয়েকজন উপযুক্ত ত্যাগী নারীকে দেন সন্ন্যাস, ১৯৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয় দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠের। ১৯৬১ সালের মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মিশন রেজেস্ট্রি হলে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমুন্নত আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে সাধু ব্রহ্মচারীদের যে শিক্ষার ওপর স্বামীজী জোর দিতেন সেই ধারাতে শিক্ষা দিয়ে সংঘের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য ১৯৫৩ সালের ১৩ মে বেলুড় মঠে তিনি এক ব্রহ্মচারী শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন।

তাঁর জীবনবীণার মূল তারটি বাঁধা ছিল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রিক সন্ন্যাসাদর্শে। তাই শত কাজের মধ্যেও জীবনে নিত্যকর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হননি কখনও। বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বই পড়া ছিল তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। তাঁর কথায়, "লোকে কথা বললে আর আমি কিছু বুঝব না? এই মনে হওয়ায় কলেজজীবনের পর যে বিষয়ে কলেজে পড়িনি সেই সব বিষয়ে পড়া ও জানা শুরু করি।" এই ভাবেই তিনি যেমন শিখেছিলেন ছুতোরের কাজ, উদ্ভিদ বিদ্যা, ডাক্তারি, কবিরাজি, যন্ত্রবিদ্যা, রন্ধন, বই বাঁধানোর কাজ, তেমনি পুরাণ, গীতা, বাইবেল প্রভৃতিরও বিভিন্ন অংশ ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ।

সংঘের প্রাচীন তথ্যাদি সংগ্রহ এবং প্রকাশনার কাজও তিনি করেছেন অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে। সংঘাধ্যক্ষ হবার পরও কঠোর পরিশ্রমে তিনি স্বামীজীর প্রত্রাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। কাজ শেষে তিনি বলেছিলেন আমার রিজার্ভড এনার্জি শেষ হ'ল। ব্রহ্মানন্দজী সম্পর্কিত বই গুলির বহু তথ্যও তিনিই সংগ্রহ করেছিলেন।

নানাভাবে সংঘের প্রসার, মুমূর্ষু মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে দিতে একদিন শরীর হ'ল জীর্ণ। বুঝলেন শেষ হয়ে এসেছে তাঁর কাজ। ওই সময় একদিন তিনি বলেন, "দেখ এ শরীর আর ভাল হবে না। দেখতে দেখতে শুয়ে বসে ক'টা বছর কেটে গেল। এমন করে আর কতদিন চালাতে হবে প্রভূই জানেন। ঠাকুর তুমিই জানো আমার গতি! আমার হাত বাড়িয়েই অ'ছি। আমায় টেনে কোলে তুলে নাও প্রভু।"

তাঁর কোষ্ঠীব ভৃগু গণনায় ছিল ইচ্ছামৃত্যুব কথা। সে প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, "ইচ্ছা মৃত্যু মানে কি জান? ভগবানের ইচ্ছাই ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা যুক্ত করা।"

এল ১৯৮২ সালের ১২ জানুয়ারি শুক্রবার। সামান্য জর হল তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল। সন্ধ্যের দিকে এল একটু আচ্ছন্ন ভাব কিন্তু জ্ঞান ছিল যথারীতি। রাত বাড়তে থাকে। কারো মনেই তেমন কোন আশংকা নেই। কিন্তু তখন কেউ জানত না যে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলেছে তাঁরও ইচ্ছা। রাত ৩টে ১০ মিনিটের সময় মহাসমাধি ফেলে আশ্রয় নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণলোকে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

অজ্ঞান তিমিরেষস্ত জ্ঞানালোক প্রদীপকঃ
নমোঽস্তু শ্রীরামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

কেমন আছ বাবা? পথে তেমন কষ্ট হয়নি তো? জয়রামবাটিতে পুরাণো বাড়ির রোয়াকে বসে তরকারী কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করলেন মা। সেই স্নেহমাখা স্বরে সব কিছু যেন গুলিয়ে যায়। মাতৃদর্শনে এই প্রথম আশা। কোন পরিচয় পর্যন্ত নেই। অথচ বহুদিন বাদে ঘরে ফেরা ছেলেকে যেমন ভাবে আদর করে জিজ্ঞেস করেন মা—ঠিক সেইভাবে—যেন কত জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ। অথচ জয়রামবাটিতে আসার সময় মনে কতই না ভাবনা ছিল। সঙ্গে কোন চিঠিপত্র নেই, চেনা জানা কেউ নেই; কেইবা পরিচয় করিয়ে দেবে ইত্যাদি।

কি বাবা, কষ্ট হয়নি তো?

ভাবনায় ছেদ পড়ে। ভাবে এ জিজ্ঞাসার কি বা উত্তর। তাই উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে মা'র দিকে দুচোখ মেলে।

এসো বাবা, এসো।

মা।

বল?

আমি আপনার জন্য বর্ধমানের মিহিদানা এনেছিলাম। কিন্তু কামারপুকুরে সেই মিহিদানার হাঁড়িতে কুকুরে মুখ দিয়ে ছিল। তাই এই জিলিপিগুলো এনেছি এটা নিন মা।

দাও। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেন। মা'র সে আন্তরিকতা দেখে ছেলে অভিভূত। সেও সহজ হয় এবার। তাই তার আবার প্রশ্ন, কেন এমন হ'ল মা?

কিসের বাবা।

কামারপুকুরে ঠাকুরকে ভোগ দেবার জন্য হাঁড়ি থেকে মিহিদানা রাখছি এমন সময় ভেতর বাড়ি থেকে আমাকে ডাকায় ওগুলো ওখানে রেখে তাড়াতাড়ি যাই ভেতরে। একটু বাদেই এসে দেখি কুকুরে খাচ্ছে সে মিহিদানা। আমি আপনাকে মিহিদানা দিতে পারলুম না, এ কথা ভাবতেই বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে।

দুঃখু কোরো না বাবা। হয়ত কপালে লেখা ছিল না তাই আমি ছেলের আনা মিহিদানা পেলাম না। হেসেই বলেন মা।

কিন্তু কেন এমন হ'ল ?

ছেলের দেখছি দুঃখু যায় না। তা তুমি তো এলে বর্ধমান দিয়ে।

হ্যাঁ।

সেখান থেকে কি ভাবে এলে।

কেন গরুর গাড়িতে।

গাড়োয়ান কে ছিল ?

কেন মা ?

বলই না।

একটি বুড়ো মতন মুসলমান।

তাহলে ওই জন্যই হয়েছে। জানো তো বাবা, তোমাদের ঠাকুরের পিতামশাই কত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর আরাধ্য দেবতার সেবায় ও জিনিস লাগবে না তাই নষ্ট হযেছে।

শ্রীমা'র এ কথায় মন ভরে যুবকের—নাম যাঁর জিতেন—পরবর্তীকালের জিতেন মহারাজ—স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ।

সেবার মা খুঁটিযে খুঁটিযে সব শুনলেন জিতেন-এর কাছ থেকে। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে ঠাকুরের কথা শুনলে ?

সে এক অপূর্ব যোগাযোগ মা। থাকি হাওড়া বাঁটরায। ওখানকার হাইস্কুল থেকে এনট্রান্স দিযেছি। পড়ার ঝোঁকটা আমার চিরকালের—তাই রোজই প্রায় মেটকাফ হলে ইম্পিরিযাল লাইব্রেরীতে যাই বই পড়তে।

সেটা ছিল গ্রীষ্মকালের এক দুপুর। পড়তে পড়তে ব্রহ্মতালুটা হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠল—যেন আগুন বেরুচ্ছে। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য উঠে পাযচারি করছি। হঠাৎ নজর পড়ল আলমারিতে একটা বইয়ের ওপর—'শ্রীরামকৃষ্ণ : হিজ লাইফ অ্যাণ্ড সেয়িংস'। বেয়ারাকে বললাম নামিয়ে দিতে। বইটা নিয়ে দুচার পাতা ওলটাতেই মনে হয়,—এই তো সেই যাঁকে আমি খুঁজছিলাম এতদিন ধরে।

আদ্যোপান্ত পড়ে ফেললাম বইটা। পেয়ে গেলাম আমার ঠিকানা। সেটা ১৯০৪ সালের কথা। শুরু হ'ল দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত। সেখানেই একদিন শুনলাম শরৎ চক্রবর্তী মশাই রামলাল দাদাকে বলছেন, মা কেমন আছেন ?

চমকে উঠলাম, মা, কে এই মা ? রামলালদাদাকে জিজ্ঞেস করলাম—জানলাম সব কথা। তারপরই চলে এলাম এখানে।

আদর করে মা বলেন, বেশ করেছ।

এবার যেন ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় জিতেনের কণ্ঠে। তিনি বলেন, মা আপনি একবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে আমার ভগবান লাভ হয়ে যাবে। দিন না মা।

হ্যাঁ বাবা, ছেলেদের কারো, তোমার দীক্ষা হয়েছে কি ?

না, মা।

তবে কালই দেবো তোমাকে দীক্ষা। এখন বিশ্রাম কর কেমন। পরদিন ‥ ডিসেম্বর রবিবার ১৯০৬ সাল। বিশুদ্ধানন্দজীর নিজের কথায়, "সেটা আমার জীবনের পরম শুভদিন। সকালে দামোদরে স্নান করে এসে দেখলুম মা পুজোয় বসেছেন। পাশে একখানি আসন পাতা ছিল, বসতে ইসারা করলেন। দীক্ষা দিলেন। বললেন, আজ তোমাকে ঠাকুরের সিদ্ধ বীজমন্ত্র দিলাম।

কখন ও কিভাবে জপ করতে হবে বলে দিলেন মহামন্ত্র। পরে আমার এত আনন্দ হ'ল যে, দামোদরের নির্জন তীরে ছুটে গিয়ে একলা খুব নেচেছিলুম।"

শ্রীরামকৃষ্ণঃ হিজ লাইফ এণ্ড সেয়িংস বইটি পড়েই যুবক জিতেন পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পথটিকে খুঁজে। চলে এলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে। প্রথম দিনের সে স্মৃতি ছিল তাঁর কাছে চিরঅম্লান। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং অনুজপ্রতিম গুরুভাই কেশবচন্দ্র নাগকে তিনি শুনিয়েছিলেন সেই স্মৃতির কথা। তিনি বলেন, 'প্রথম দিন শেয়ারের গাড়িতে বরানগর পর্যন্ত যাইয়া তথা হইতে হাঁটিয়া ঘামিতে ঘামিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি পৌঁছিয়া দেখি, মন্দিরের দ্বার কিছুক্ষণ পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল, যেন সংজ্ঞাহারা হইলাম, হঠাৎ দেখি রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে জগদম্বার শ্রীমূর্তি।"

তারপর থেকে সপ্তাহে একদিন, পরে দু তিনদিন করে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে সে ধ্যান করতেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত ছোট ঘরটাতে মাঝে মাঝে রাত্রিবাসও হয়।

১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত এইভাবেই চলে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত, ধ্যান। ধীরে ধীরে পরিচিত হলেন স্বামীশিষ্য প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, কথামৃতকার

মাষ্টার মশাই শ্রীম, ঠাকুরের ভাইপো রামলাল দাদা প্রভৃতির সঙ্গে। তাঁদের মুখে শুনতেন ঠাকুরের কথা, তাঁর ভক্তদের কথা। যত শুনতেন ততই প্রাণ ভরে ওঠত

প্রথমদিকে তিনি কালীবাড়িতেই প্রসাদ পেতেন। কিন্তু একদিন সেকথ শুনে মাষ্টারমশাই শ্রীম বললেন, না এটাতো ভাল নয়। এ অন্ন সাধু ফকিরের জন্য, আমাদের জন্য নয়। সে কথা শুনে জিতেন্দ্রনাথ এবার থেকে সঙ্গে চিঁড়ে, চিনি লেবু নিয়ে আসতেন, তাই খেতেন তিনি আর পঞ্চবটীতে ধ্যানে ডুবে থাকতেন।

এল ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর। জিতেন্দ্রনাথ গেলেন জয়রামবাটিতে—পেলেন শ্রীমা'র দর্শন—হ'ল দীক্ষা। জীবনের ভিত্তি হ'ল দৃঢ়। মন কিন্তু আনচান করে সংসার ছাড়ার জন্য। একদিন গেলেন জ্ঞানানন্দ অবধূত বা নিত্যগোপাল দেবের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে, আচ্ছা বলুন তো, আমার গৃহত্যাগের সময় হয়েছে কিনা? অবধূত জ্ঞানানন্দ তাঁকে বললেন, হ্যাঁ সময় হয়েছে ঘর ছাড়ার

বাবা, মা, আগেই মারা গেছেন। ভাই বোনে থাকতেন দিদিমার কাছে তিনিও একদিন গত হলেন। সংসারে বন্ধন বলতে শুধু ছোট বোন রাণীবালা একদিন পুরনো হাওড়া পুল দিয়ে আসছেন তখন যেন তাঁর কানে এল রাণীবালার গলা, 'দাদা আমি তো চলে গেলাম। আর কেন? এখন তো তোমার কোন বন্ধন রইল না।' এরপরই চিঠি এল বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে হঠাৎ-ই মারা গেছে রাণীবালা।

জিতেন্দ্রনাথ এখন বন্ধন মুক্ত। ইস্তফা দিলেন শালিমারের চাকরিতে। তারপর আবার যান জয়রামবাটিতে শ্রীমাকে দেখতে। এবার সঙ্গী ছিল তাঁর হাওড়া কাসুন্দিয়ার খগেন্দ্রনাথ মল্লিক (স্বামী শান্তানন্দ) ও বালীর তরুণ (গিরিজানন্দ)। তিনজনেরই ইচ্ছে হেঁটে যাবেন চারধামে তারপর কোন নির্জন গাছতলা বা পাহাড়ে বসে দেহত্যাগ করবেন। সেই শেষ যাত্রার আগে একবার মাকে দেখার জন্য তাঁদের এই জয়রামবাটি যাত্রা।

জয়রামবাটিতে মা-কে সব কিছু বললেন তাঁরা। মা কিন্তু তখনই কোন কথা বললেন না। শুধু বললেন, কয়েকটি দিন এখানে থেকে যাও। তারপর একদিন ঠারে ঠোরে শোনালেন মহাঅভয়বাণী—"তোমরা কেন এত কষ্ট করতে যাবে। সে যারা করবে করুক। তবে তোমাদের যখন এত ইচ্ছা হয়েছে পায়ে হেঁটে কাশীতে যাও, আমি অদ্বৈত আশ্রমে তারক-বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

জয়রামবাটিতে তাঁরা কাটালেন ন'রাত্রি। ১৯০৭ সালের ২৮ জুলাই। শ্রীমা'র নির্দেশে মাথা ন্যাড়া করে কাপড় ছোপালেন। পরদিন ২৯ জুলাই ১৩১৪ সালের

১৩ শ্রাবণ মা তাঁদের সন্ন্যাসের চিরপবিত্র গেরুয়া ও ডোরকৌপীন দিলেন। কাশী যাবার জন্য তাঁরা রওনা হলেন কামারপুকুর। যাবার আগে মা তাঁদের ঠাকুর ঘরে এসে আশীর্বাদ করে বেলপাতা দিলেন। শ্রীঠাকুরের বেদীতে প্রণাম করার নির্দেশ দিয়ে মা নিজেও হাতজোড় করে বললেন, "ঠাকুর এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো, আর পাহাড়ে জঙ্গলে যখন যেখানে থাকে দু'টি দু'টি খেতে দিও।"

সে যাত্রায় তিনমাস পায়ে হেঁটে কপর্দকহীন অবস্থায় শুধু ভিক্ষা সম্বল করে দেওঘর, গযা হয়ে পৌছলেন কাশীতে। অদ্বৈত আশ্রমে এবার তাঁরা সাধন ভজনে মগ্ন হলেন, মা'র নির্দেশমত মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ তিন নবীন সন্ন্যাসীর নামকরণ করলেন বিশুদ্ধানন্দ, শান্তানন্দ ও গিরিজানন্দ।

১৯০৭ সালের ৭ এপ্রিল আশ্রমে রাজামহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ এলে তাঁকে তাঁরা দর্শন করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল বিশুদ্ধানন্দের বিশুদ্ধ সংস্কার। তিনি বুঝলেন উত্তর জীবনে এ হবে সংঘের স্তম্ভস্বরূপ। তাই কাশী থেকে বেলুড়ে ফিরেই তিনি লিখলেন, বেলুডে স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে পাঠিয়ে দেবার জন্য। আগস্ট মাসে বিশুদ্ধানন্দ প্রথম বেলুড়ে এলেন।

বেলুড়েও কিন্তু বিশুদ্ধানন্দের বেশিদিন থাকা হ'ল না। মাস দেড়েক বাদেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে পাঠিযে দিলেন মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের কাছে। রাজা-মহারাজ তাঁকে পাঠাবার আগেই মাদ্রাজে চিঠি দিয়ে লিখলেন, "একজন সাধু পাঠাইতেছি, সে সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় বিভোর থাকে।"

মাদ্রাজে বছর খানেক শ্রীরামকৃষ্ণানন্দের কাছে থাকার পর স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে পাঠানো হ'ল বাঙ্গালোরের নতুন আশ্রমে। আশ্রম অধ্যক্ষ নির্মলানন্দকে নানা কাজে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হ'ত। তাই এই নতুন আশ্রমের প্রভাব বিস্তার, সৌন্দর্য বিধান ইত্যাদির জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত।

ওই সময়ই শ্রীমা এলেন দক্ষিণ-ভারত দর্শনে। তিনি বাঙ্গালোরে ছিলেন চারদিন। সে সময় তাঁকে বিশেষ ভাবে সেবা করার সুযোগ পান তিনি।

পাঁচ বছর বাঙ্গালোর আশ্রমে কাটিয়ে বিশুদ্ধানন্দ বের হলেন তীর্থ দর্শনে। ১৯১৬ সালের জানুয়ারিতে এলেন কাশী। সেখান থেকে স্বামী অবলানন্দের সঙ্গে গেলেন জয়রামবাটি। উদ্দেশ্য মা কিভাবে ঠাকুরের তিথি পূজা করেন তা দেখা। তা দেখেছিলেন তাঁরা। তিথি পূজার দিন তিনেক আগেও কোন জোগাড় যন্ত্র নেই। তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, কিন্তু শ্রীমাকে উদ্বেগ হীন দেখে মনে হয় সবকিছু যেন তাঁর তৈরিই আছে। একদিন মনের উদ্বেগ চাপতে না পেরে বিশুদ্ধানন্দ

তাঁকে বললেন, "মা, ঠাকুরের তিথি পূজা হবে না। একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গেল, আহা সে হাসিটি এখনও মনে আছে। বললেন, বাবা কি হবে জানি না। সে শক্তিও নেই। উত্তর শুনে হতাশ হলুম। তারপর হঠাৎ দেখি বাঁকুড়ার এক ভক্ত এসে উপস্থিত, সঙ্গে দু গরুর গাড়ি ভর্তি নানাম জিনিস। পূজার উপাচার থেকে আরম্ভ করে প্রায় হাজার লোকের খাওয়া দাওয়ার সমস্ত উপকরণ।

দেখ কাণ্ড, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। বলেন কিনা শক্তিও নেই ভক্তিও নেই। শক্তি ভক্তি সবই যে মা তুমি। ঠাকুর আর মা কি আলাদা, টাকার এপিঠ ওপিঠ।

মা এমন অপূর্ব তিথি পূজা করলেন যা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। ভাষায় কি প্রকাশ সম্ভব ?"

তিথি পূজার শেষে বিশুদ্ধানন্দ এলেন বেলুড়ে। সপ্তাহ তিন সেখানে থেকে আবার কাশী। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে ১৯:৭ সালের মে মাসে গেলেন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে। এইখানে স্বামী বিরজানন্দের কাছে চলল তাঁর সাধনা আর 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর জন্য কাজ।

এল ১৯২০ সালের ২১ জুলাই। শ্রীমা স্বস্বরূপে লীন হলেন। সে সংবাদ পেয়ে বিশুদ্ধানন্দ কিন্তু মায়াবতী থেকে নামলেন না। এ সম্পর্কে তাঁর কথা, "যতদিন মা স্থূল শরীরে ছিলেন কত ছুটাছুটি—জয়রামবাটি কলকাতা।...তারপর আর দৌড় ঝাঁপ নেই—বুকের ভিতর স্থির। একবারে এইখানে বসে আছেন।"

অক্টোবর নাগাদ বিশুদ্ধানন্দ মায়াবতী থেকে কাশী হয়ে এলেন বেলুড়ে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন রয়েছেন ভুবনেশ্বর মঠে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দও গেলেন সেখানে। সেখান থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আবার কাশী। কাশী থেকে মায়াবতী। এবার ন'মাস ধরে চলে বিশুদ্ধানন্দের সাধনা। এই সময় এল স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডাক। বিশুদ্ধানন্দ গেলেন বেলুড়ে।

১৯২২ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রস্তাবে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও স্বামী মাধবানন্দকে করা হ'ল মঠের অছি এবং পরিচালক সমিতির সদস্য। সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, "এই অল্প বয়স্ক সাধুদের অছি ও সদস্যরূপে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে নিরাপদ। সংঘের অহিত সাধন বরং আমাদের দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ইহাদের দ্বারা কখনই নয়।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটতে থাকে বিশুদ্ধানন্দের দিন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ খুবই স্নেহ করতেন। তাঁকে তিনি বলতেন,

যোগভ্রষ্ট ঋষি'। ১৯২২ সালের ১০ এপ্রিল এই যোগভ্রষ্ট ঋষির হাত থেকে গঙ্গবারি নিয়ে শেষ যাত্রা করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

এরপর চলতে থাকে পর্যটন আর তপস্যা। ১৯২৫—২৬ সালে তিনি ছিলেন ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ। তারপর আবার পর্যটন। স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁরই অন্তিম অনুরোধে তিনি গেলেন রাঁচি। মোরাবাদী পাহাড়ের কোলে প্রতিষ্ঠা করেন একটি আশ্রম। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত টানা পঁচিশ বছর এখানে থেকে করেন সাধন ভজন এবং লোক কল্যাণ কর্ম। সে সময় বহুলোক রাঁচি যেতেন শুধু জিতেন মহারাজের পুণ্য সঙ্গের আশায়।

১৯৩৭ সালে তিনি হন মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ। ১৯৫১ সাল থেকে কয়েক বছর তিনি ভারতবর্ষের নানা জায়গায় গিয়ে একই সঙ্গে ধর্মপ্রচার এবং সেবাকার্য চালিয়ে যান। সেই বৃদ্ধ বয়সেও ছিল তাঁর যুবকের উৎসাহ। এ সম্পর্কে কেউ কিছু বললে তিনি বলতেন, "ভগবান এই শরীর দ্বারা যাহা করাইতে চান করাইয়া নিন।"

১৯৬০ সালে পুজোর সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কাশী থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। অস্ত্রোপচারের পর তিনি কিছুটা সুস্থ হলেন। জীবনের শেষ ক'টা দিন বাবা বিশ্বনাথের কাছে কাটিয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে ২২ ডিসেম্বর তিনি বারাণসী যান। এই সময় তাঁর মানসিক ইচ্ছা ও অবস্থার কথা জানিয়ে তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দকে লেখেন, "আমি এখন কাজ হইতে ছুটি নিয়ে বার্ধক্যের বারাণসীতে আছি। প্রভুর কৃপায় বর্তমান অসুখটা আমার পক্ষে ব্লেসিং ইন ডিজগাইজ বলে মনে হচ্ছে। মোটের ওপর মানসিক খুবই ভাল আছি, প্রভুর অপার করুণা। এই বৃদ্ধ শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে বেশ বুঝতে পারছি। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন রাখবেন সেই ভাবে থাকতে হবে। নান্যঃ পন্থা।"

কিন্তু চিরটাকালই মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আরেক। শিবপুরী কাশীতে বিশুদ্ধানন্দ যখন নিত্য ধ্যানানন্দে রয়েছেন বিভোর সেই সময় ১৯৬২ সালের ১৩ জানুয়ারি মঠের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহাসমাধিতে মগ্ন হলেন। মঠ ও মিশন থেকে স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে অধ্যক্ষের কার্যভার নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান হ'ল। কিন্তু তিনি বারাণসী ছেড়ে আর যেতে চান না। যত অনুরোধ আসে তিনি জবাবে শুধু বলেন, না।

ওই সময় মাধবানন্দজী আমেরিকা থেকে ফিরে তাঁকে লেখেন—মঠের

সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্বভার তাঁকেই নিতে হবে। এবার আর অরাজি হতে পারলেন না বিশুদ্ধানন্দ। তারবার্তা পাঠালেন, 'প্রেসিডেন্টশিপ অ্যাকসেপটেড—ঠাকুরস উইল বি ডান—বিশুদ্ধানন্দ।'

১৯৬২ সালের ৭ মার্চ মঠাধ্যক্ষ রূপে তিনি আসেন বেলুড়ে। ১৫ মার্চ পবিত্রানন্দকে চিঠি দেন, "প্রভু আমাকে কাশী হতে টেনে প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়েছেন। আমি সম্পূর্ণ অসহায়। তাঁর ইচ্ছাই বলবৎ। এখন দেখি জীবনের এই শেষ অধ্যায়টা আমাকে দিয়ে কিভাবে অভিনয় করান। এখন সম্পূর্ণ তাঁর হাতের যন্ত্র স্বরূপ। নাহং—নাহং তুহুঁ তুহুঁ।"

শরীর ক্রমশঃ নানা রোগভারে জীর্ণ হতে থাকে। তিনি কিন্তু 'ঠাকুরের ইচ্ছা' বলে অধ্যক্ষের করণীয় সব কাজ করে যান হাসি মুখে। দর্শনার্থী, জিজ্ঞাসু ভক্ত, সাধু ব্রহ্মচারী সকলকেই অধ্যাত্ম পথে দেন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা।

১৯৬২ সালের ১০ জুন তাঁর জন্মতিথি পালিত হ'ল। ১১ জুন ছিল তাঁর প্রস্টেট অপারেশনের দিন। ৮ জুন তিনি বারাণসী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দকে লিখলেন, "প্রস্টেট অপারেশনের বিরাট আয়োজনাদি চলিতেছে—মহাষ্টমী পূজার মতন। এখানে বসিয়াই বড়ো ডাক্তার প্রভৃতির আগমনে পরীক্ষাদি যাহা যাহা প্রয়োজন খুটিনাটি অনেককিছুই হইয়া যাইতেছে। প্রভুর অসীম করুণা। আগামী ১১ তারিখ বেলা ১০টার পর সেবা প্রতিষ্ঠান হইয়া নার্সিংহোমে যাইব; সেবা প্রতিষ্ঠানে এক্সরে হইবে। মঠ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহারাজের নিকট এই প্রার্থনাই করিয়া যাইব যেন জীবনের অভিনয় শেষ হয়। এখন সব তাঁদের হাত, তাঁদের ইচ্ছাই বলবতী।"

১১ জুন সকালে যাত্রার দিন স্বামী মাধবানন্দের কাছে বারবার বিদায় চেয়ে বললেন, "চললুম, এসপার ওসপার একটা হোক। আমার প্রাণের ইচ্ছা তুমি অধ্যক্ষ হও।"

সহাধ্যক্ষ মাধবানন্দজী বললেন, "ওসব কথা কেন? ওসব তো মিটে গেছে। ওপারের কথা ভাবছেন কেন? ঠাকুরের কৃপায় আপনি ভাল হয়ে আসবেন নিশ্চয়ই। দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ।" সে কথার আর কোন জবাব দেননি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ।

১৩ জুন অপারেশন হ'ল, সাকসেসফুল। কিন্তু উপসর্গ দেখা দিল অন্য। ১৪ ও ১৫ জুন কাটল তার অসহ্য যন্ত্রণায়। ১৫ জুন রাত। ঘরের আলো স্তিমিত। অকস্মাৎ তিনি বলে উঠলেন, "এত আলো কেন? এত আলো কেন?" হৃদয়ে

হাত রেখে করদ্বয় করে চলেছে তখন জপ। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিলেন। ১৬ জুন শনিবার সকাল ৯টা বাজার কয়েকমিনিট পরেই পাশের ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন খৃস্টান নার্স। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তখন যাত্রা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ লোকের দিকে।

সেদিন, "শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইয়া সকলে যেন আপনাদিগকে মাতৃহারা বোধ করিতেছেন। তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যে যাঁহাদেরই আসিবার সুযোগ হইয়াছে তাঁহারাই মাতৃহৃদয়ের ভালবাসা আস্বাদন করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে যে অপার স্নেহ সমুদ্রের আকর্ষণে তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, জগজ্জননীর সেই অপার্থিব স্নেহপ্রেমই তাঁহাকে উত্তরজীবনে মহান গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"

১৮৮৩ সালের ১৩ জুন বুধবার শুক্লাষ্টমীতে মামার বাড়ি হুগলি সদরের গুড়াপ গ্রামে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ রায়। বাবা হেমচন্দ্র রায়, মা কিরণবালা দেবী। বর্ধমানের আবুঝাটি গ্রামে ছিল তাঁদের বাড়ি। কৌলিক পদবী ছিল সিংহরায়। কিন্তু তাঁরা 'সিংহ' বর্জন করে শুধু রায়-ই লিখতেন।

ছোটবেলাতেই তিনি হারান বাবা মা-কে। দিদিমা কুলবালা দেবী তাঁকে এবং তাঁর ছোটবোন রাণীবালাকে নিয়ে আসেন গুড়াপে। দিদিমা ছিলেন ধর্মপ্রাণা এক শক্তিসাধিকা। তাঁর প্রভাবে ছোটবেলা থেকেই জিতেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। সেই বয়সেই সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি ছিল তাঁর অসম্ভব টান।

গ্রামের পাঠশালাতেই শুরু বিদ্যাশিক্ষা। পরে ভর্তি হন স্থানীয় মিডল ভার্না-কুলার স্কুলে। সে সময় গুড়াপে কোন উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল না। তাই জিতেন্দ্রনাথ মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের স্কুলে ভর্তি হয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এই সময়ই দিদিমা মারা গেলে জিতেন্দ্রনাথ ফিরে আসেন গ্রামেই। ততদিনে ছোটবোন রাণীর বিয়ে হয়ে গেছে।

জিতেন্দ্রনাথ এবার গ্রামসম্পর্কীয় দাদা প্রসন্নকুমার নাগের সঙ্গে আসেন হাওড়া কাসুন্দিয়ায়। ব্যাঁটরা হাইস্কুল থেকে ১৯০১ সালে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। ওদিকে তাঁর মনে উঠেছে ঝড়। আবাল্য লালিত আধ্যাত্মচেতনা এবার তীর্থ-দর্শনের মাধ্যমে বিস্তৃত হতে চায়। একদিন মা কিরণবালা পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জগন্নাথ দেখা তাঁর হয়নি। আজ তীর্থযাত্রার শুরুতে তাই বোধ হয় জিতেন্দ্রনাথের পুরীর কথাই মনে হ'ল। কাউকে

কিছু না বলে তিনি পুরী চলে যান। পুরী থেকে ফিরে তিনি প্রসন্নদাকে বলেছিলেন, তিনি যদি অনুমতি না দেন—এই ভয়ে কিছু না বলেই পুরী গিয়েছিলেন।

যাই হোক, জিতেন্দ্রনাথ এবার গুড়াপে ফিরে এলেন। সাধন-ভজন, আর্তসেবার মধ্যে কাটে দু'টি বছর। বহুদিন পরে তাঁর 'বার্ধক্যের বারাণসী'-তে বলেন, "তখন গুড়াপে নন্দদুলালজীর মন্দিরে ধ্যানাভ্যাস করতুম, মা-কালীর ধ্যানই ছিল প্রিয়; একদিন খুব জমে গেছি, এমন হয়েছে যে দেহবোধ নেই, ধ্যেয়বস্তু ও আমি সত্তার বোধ শুধু রয়েছে। কতক্ষণ ওইভাবে ছিলুম তা বলতে পারি না, যখন বাহ্যজ্ঞান এলো দেখলুম শিরদাঁড়া সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। তারপর আসন ছেড়ে উঠতেই এক আশ্চর্য অনুভূতি: দেখছি জগৎ মধু দিয়ে তৈরি, মানুষ জীবজন্তু গাছপালা—সব মধুর। মধু বৃষ্টি হচ্ছে, গাছের পাতা থেকে মধু ঝরে পড়ছে। ধ্যানের আনন্দে বিভোর, তার উপর ঐ অনুভূতি আরো অভিভূত করলে। সে আনন্দের নেশা ক'দিন ধরেই চলেছিল।"

প্রথম থেকেই যে ধ্যান ছিল জিতেন্দ্রনাথের অতি প্রিয় বস্তু শ্রীমা'র কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগ দেবার পর সেই ধ্যানে দিব্য আনন্দে তিনি নিত্যই থাকতেন মেতে। তিনি মনে করতেন যা কিছু হয়েছে বা হচ্ছে সবের মূলেই আছেন ঠাকুর। এই প্রসঙ্গেই একদিন তিনি বলেন, "ঠাকুর বলতেন, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন গাছের পাতাটি নড়ে না। ভেবেছিলুম শেষের ক'টা দিন বিশ্বনাথের দরবারেই কাটাবো, কিন্তু চলে আসতে হ'ল জগন্নাথের দরবারে। আমি ব্যালেন্স কষেছিলুম 'কাশীবাস', তিনি কেটে করে দিলেন 'মঠবাস'। তাঁর হিসাব ভুল হবার জো নেই, তাইতো আবার আসতে হ'ল, বসতে হ'ল এখানে। আমি গাছতলার ফকির, এসব আমার ভালো লাগে না, কিন্তু আমার ইচ্ছা মতন হচ্ছে কই।"

বিশুদ্ধানন্দজী ধ্যান আর নামে পেতেন আনন্দ। সকলকে বলতেন ধ্যান ও নাম করতে। ওই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "আর সব কাজের জন্য আমরা বেশ সময় পাই, মুখে পারিনা পারিনা বললেও সংসার যাত্রা ঠিক চলছে, শুধু তাঁকে ডাকার বেলায় সময়ের অভাব। জাগতিক সাফল্যের জন্য প্রাণপণ খাটছি, দুনিয়ার যত কাজ সব নিজের চেষ্টাতেই হচ্ছে—শুধু ভজনের বেলায় ভাবছি তিনি সুযোগ না দিলে কেমন করে তাঁকে ডাকবো। ফাঁকি দেবার বেশ ভাল রাস্তা বার করেছি আমরা।"

ঈশ্বরকে ডাকার—তাঁকে ভাবার সময় পাইনা বলে যাঁরা কাঁদুনি গান তাঁদের

উদ্দেশ্যে তাঁর কথা, "লেখাপড়া শেখার জন্য তো কত পরিশ্রম করতে হয়, স্কুল ফাইনালটা পাশ করতেই দশ বছর। ছবি আঁকা শিখতে হলে কত খাটতে হয়। ভগবান লাভ কিনা এত সহজে হয়ে যাবে।"

আপন সাধনায় নিষ্ঠা না রেখে শুধু উপদেশ দেওয়ায় তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী। যাঁরা ওই কাজ করেন তাঁদেরও তিনি সমর্থন করতেন না কোন ভাবে। তিনি বলতেন, "আজকাল সবাই উপদেশ দিতে ব্যস্ত, উপদেশের সঙ্গে জীবনের কতটুকু মিল আছে ভেবে দেখার সময় নেই। তেমন উপদেশে কাজ হয় না। প্রথমে ধর্মজীবন গঠন করা চাই। কথা আর কাজে মিল থাকলে তবে অপরে নেবে নচেৎ নেবে না।"

বিশুদ্ধানন্দজী তাঁর সারাটা জীবন অনুসরণ করে গেছেন। মানুষের ধর্মজীবন গঠন করাই ছিল তাঁর সাধনা। সবদিক থেকে সবাইকে মানুষ করে তোলার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এমন কি মানুষের গৃহজীবনকে সুন্দর করে তোলার নির্দেশও দিতেন তিনি। বলতেন কর্তব্যনিষ্ঠার পথে অবিচল থাকতে। বলতেন, 'সবাই কি বাড়িঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে? যে যেখানে আছো সেখান থেকে নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেলে জীবন সার্থক হবে।' তাঁর কথা, "আজকাল স্কুল কলেজে পড়ে মেয়েদের স্বভাব অন্য ভাবে গড়ে উঠছে। যে শিক্ষায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলিয়ে দেয় তার ফল কখনও শুভ হতে পারেনা।"

মানুষের এই শুভ বোধ জাগ্রত করার, তাকে শুভ পথে নিয়ে যাবার কথা বলে, শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথে চলায় উদ্বুদ্ধ করে ১৯৬২ সালের ১৬ জুন তিনি করেন মহাপ্রস্থান।

স্বামী মাধবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণং হৃদি সন্নিধায়
শ্রিয়ং বিধত্তে কৃপয়া চ মোক্ষম্।

শ্রীমা তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন, এ যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

মা'র দিব্যদৃষ্টিতে সেদিন যাঁর এই দিব্যরূপটি প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল তিনিই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ। এক বিচিত্র জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। ধ্যান ও কর্মের যুগল নদী বয়ে গেছে তাঁর জীবনে। জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন মানব সেবা এবং ঈশ্বরদর্শনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আবার সেবা ও সাধনা যে হবে তাঁর জীবনের সব এ যেন ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। এ কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল বাগআঁচড়ার এক সাধকের মুখেও।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর নির্মল—হ্যাঁ স্বামী মাধবানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নির্মলকুমার বসু। তা নির্মল হয়ে পড়ল ভয়ানক অসুস্থ। বাক্‌শক্তি তার প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। ডাক্তাররাও যখন জীবনের আশা ছেড়ে দেন সেই সময়ই সন্ধান পাওয়া যায় এক সাধুর। বাগআঁচড়ায় থাকতেন ওই সাধু। তাঁর কাছে কেঁদে পড়ল বাড়ির সবাই। বাঁচান, আমাদের ছেলেকে বাঁচান।

সাধু কিছুক্ষণ রইলেন ধ্যানমগ্ন। তারপর বললেন, এ ছেলে এখন মরবে না। এ এখন অনেকদিন বাঁচবে—জগতের অনেক কাজ এ করবে। এ ছেলে সামান্য নয়—এ অনেক বড় হবে।

কিন্তু অসুখ সারবে কি করে ?

ভয় নেই শিকড়টা নিয়ে যাও। বেটে খাইয়ে দিও। দেখবে ছেলে ভাল হয়ে গেছে।

সেইদিন সেই চরম আশঙ্কার দিনে সাধুর এই আশ্বাস বাড়ির সবার মনে

আবার জ্বালালো আশার আলো। নির্মলকে খাওয়ানো হ'ল সেই শিকড়। সাধুর কথাই ঠিক হ'ল। নির্মল বাক্‌শক্তি ফিরে পেলেন। সুস্থ হয়ে উঠলেন ক্রমশঃ।

সম্ভবতঃ এই অসুখ এবং সুস্থ হয়ে ওঠাটা নির্মলের জীবনে এমন প্রভাব ফেলে যে মৃত্যু সম্পর্কে সব ভীতি তার মন থেকে অন্তর্হিত হল। তখন তিনি মঠের অধ্যক্ষ। অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছেন বিছানায়। একদিন নিজেই উঠে বসেছেন বিছানায়। দেখতে পেয়েই সেবক ছুটে আসে হাঁ-হাঁ করে। মাধবানন্দ সেদিন তাঁকে ব্যস্ত হতে, ভয় পেতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, দেখ ভয়ই তো মৃত্যু।

এই মৃত্যুঞ্জয়ী সাধকের জন্ম ১৮৮৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর নদীয়া জেলায় বাগআঁচড়া গ্রামে। বাবা হরিপ্রসাদ বসু ছিলেন কৃতবিদ্য—এম. এ. বি. এল। মা বিন্দুবাসিনী দেবী। বাবা মা'র তিনি ছিলেন বড় ছেলে। স্বভাবতই সবার স্নেহ বর্ষিত হয়েছিল তাঁর ওপর।

ছেলের সব কিছুই ভাল। কিন্তু মাঝে মাঝেই কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। আর সেটাই আশঙ্কার ঢেউ তোলে মাঝে মাঝে মনে। ধর্মের প্রতি ছেলের একটা প্রচণ্ড টান দেখে মা'র যেমন ভাল লাগে তেমনি অজানা এক আশঙ্কার মাঝে মাঝে ওঠেন শিউরেও।

যাই হোক জীবনপ্রবাহ বয়ে যায় শান্ত ভাবেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ভর্তি করা হ'ল বোলপুরের বাঁধগোড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। মেধাবী ছাত্রটির লেখাপড়া দেখে আশ্বস্ত হন বাড়ির সবাই ভাবেন ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, শিক্ষকরা ভাবেন এছেলে তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করবে—এই দুই আশার তরণী বেয়ে এগিয়ে যায় নির্মলের জীবন। সবার দৃষ্টি তখন সবসময় থাকে নির্মলের ওপর। তার পড়াশোনার যাতে কোন ব্যাঘাত না হয়—সে যাতে প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য পায় সেদিকে নজর রাখেন মাষ্টারমশাইরা। তাঁদের আশা ব্যর্থ হয় না। ১৯০৫ সালে নির্মল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দ্বিতীয় হয়ে।

এবার তাঁকে ভর্তি করা হ'ল কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই কলেজে পড়ার সময়ই অসুখে হয় তার জীবন সংশয়। সে ঘটনার কথা আমরা বলেছি আগেই।

প্রথম থেকেই নির্মলের মধ্যে ছিল একটা ধর্ম ভাব, অধ্যাত্ম আলোচনায় সে পেত সুখ। সবসময়ই মনটা তার—কি নেই—কি পাই এই ভাবনায় থাকত ব্যাকুল। তার ওপর ওই অসুখ যেন তার ধর্মভাবকে করল আরো তীব্র।

পড়াশোনায় তখন পড়ল কিছুটা ইতি। নির্মলের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে সবাই। শেষে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মুঙ্গেরে। সেখানে জেঠামশাই বৈদ্যনাথ বসু থাকেন। মুঙ্গের কলেজের অধ্যক্ষ তিনি। তাই জল হাওয়া বদল আবার পড়াশোনা করার একটা সুযোগ এনে দিল মুঙ্গের।

জেঠামশাই বৈদ্যনাথবাবুও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন তার ছাত্র। স্বাভাবিকভাবেই জেঠামশাইয়ের কাছে নির্মলের ধর্মচেতনা ব্যাহত তো হ'লই না—বরং তার কপালে লাগল আরো হাওয়া।

নির্মল এফ, এ পাশ করলেন মুঙ্গের কলেজ থেকে। এবার আবার স্থান পরিবর্তন। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে আর ঠাঁই পেলেন ইডেন হোস্টেলের ১৯ নম্বর ঘরে। এই হোস্টেলেই তখন রয়েছেন রাজেন্দ্র-প্রসাদ। নির্মলের চেয়ে কিছু উঁচুতে পড়েন। ছাত্রাবাসের 'প্রিফেক্ট' বা প্রধান তিনি। যিনি পড়াশোনায় সবচেয়ে সেরা তাকেই দেওয়া হ'ত ওই পদটি। রাজেন্দ্রপ্রসাদের পর ওই পদটি পান নির্মল। তাই সহজেই বোঝা যায় ভাল ছাত্র হিসেবে তিনি তখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। রাজেন্দ্র-প্রসাদের সঙ্গেও ছিল তাঁর সখ্যতা।

এইখানেই নির্মলের জীবনে ঘটল এক বিরাট পরিবর্তন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহপাঠী সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ। সব সময়ই মেতে থাকতেন তিনি ধর্ম আলোচনায়। এই সীতাপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল নির্মলের। মনের একটা রুদ্ধদ্বার যেন খুলে গেল তাঁর। অবসর সময়ে তাঁর সঙ্গে ধর্মের নানা কথা নিয়ে সময় কাটত তাঁর। তাঁদের সে আলোচনার অনেকখানি জায়গাই দখল করে রেখেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। সীতাপতিও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হন। তাঁর নাম ছিল স্বামী রাঘবানন্দ।

এইসময় নির্মলের জীবনকে প্রভাবিত করেন আরেকজন। তিনি হলেন কথামৃতকার মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মাষ্টারমশাই সন্ধান পেয়েছিলেন এই তরুণটির আধ্যাত্মলোকের। তাই বিশেষ স্নেহের চোখেই দেখতেন তিনি তাঁকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তাঁর সঙ্গ পেয়ে নির্মলের প্রাণে জাগে শ্রীমাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা।

মা তখন থাকেন জয়রামবাটিতে। তাই নির্মলরা তিন বন্ধুতে মিলে ঠিক করলেন তাঁরা জয়রামবাটিতে যাবেন মা-কে দর্শন করতে। তখন জয়রামবাটিতে যাবো ভাবলেই ঠিক যাওয়া যেত না। পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম—যানবাহনও

প্রায় ছিল না বললেই হয়। কিন্তু মানুষের মনে জাগে যখন কোন শুভচেতনা তখন কোন বাধাই আর শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নির্মলদের হ'ল তাই। ১৯০৮ সালের শেষাশেষি সেটা। তাঁরা চলে গেলেন জয়রামবাটিতে। মা-কে দেখলেন—হৃদয় হারালেন। যা ছিল হৃদয়ের একান্ত আপন সম্পদ তাকে রাখলেন আবার হৃদয়েই। তাই কোন স্মৃতির ঠাঁই এখানে হ'ল না। মাধবানন্দজী পরে এ সম্পর্কে বলেছেন, "১৯০৮ সালের শেষ ভাগে তিন বন্ধুর সহিত জয়রামবাটিতে শ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করি। দুঃখের বিষয় সেই দর্শনের অতি অস্ফুট স্মৃতিই এখন মনে রহিয়াছে।" মনে যতটুকুই থাক, হৃদয়ভরে উঠেছিল কানায় কানায় আর মাও চিনেছিলেন তার সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতির দাঁত কে।

সাময়িকভাবে সবকিছু বন্ধ রেখে নির্মল আবার মন দিলেন পড়ায়। ১৯০৯ সালে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করলেন তিনি। পরীক্ষায় বাংলায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে প্রথম স্থানটিও দখল করলেন তিনি এবং সেই সূত্রে পেলেন বঙ্কিম পদক।

পরীক্ষার পরই মন তার ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ঈশ্বর সাধনার পথটিকে দৃঢ় করে ধরতে চান তিনি। সে সময় তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে ভক্তি ভবের প্রাবল্য। তাঁর তখনকার অবস্থা দেখে তাঁর এক ধর্মবন্ধু তাকে বলেন, আপনার যখন ভক্তি এত ভাল লাগে তখন মাদ্রাজে শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) কাছে চলে যান।

কথাটা যেন পথ দেখাল নির্মলকে। কাউকে কিছু না বলে একদিন তিনি পাড়ি দিলেন মাদ্রাজ। আশ্রয় নিলেম রামকৃষ্ণ মঠে শশী মহারাজের কাছে। প্রথমদিনের স্মৃতি ছিল নির্মলের হৃদয়ে অমলিন। তিনি লিখেছেন, "মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তখন সেখানে বিশ্রাম করছিলেন। শশী মহারাজ বাইরে বসে ছিলেন। উনি আমার স্নান খাবার দাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন।" মাদ্রাজ মঠে শশী মহারাজ এবং স্বামী ব্রহ্ম নন্দের সঙ্গে বেশ আনন্দে দিন কাটছিল নির্মলের। ওদিকে কেমন করে যেন বাড়িতেও পৌঁছে গেল কথাটা। বাবা তখন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য পাঠালেন গ্রামের স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারমশাইকে। নির্মল তার শিক্ষকদের খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষ করে স্কুলের শিক্ষকদের প্রভাব তাঁর ওপর ছিল অত্যন্ত বেশি। তাই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই আয়োজন।

মঠে এসে মাষ্টারমশাই বললেন সব। সে সব শুনে শশী মহারাজ নির্মলকে

বললেন, না, এভাবে চলে এসে ভাল করনি। যাও বাড়ি গিয়ে বাবা মা'র অনুমতি নিয়ে এস।

কী আর করবেন নির্মল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি ফিরলেন বাড়ি। মা বাবার পীড়াপীড়িতে ভর্তি হলেন এম-এ ক্লাসে ইংরেজি নিয়ে। এবার এসে উঠলেন একটা প্রাইভেট মেসে।

মাদ্রাজেই ব্যাকুল যুবক নির্মলকে শশী মহারাজ বলেছিলেন, 'মার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নাও। তাহলে সব হবে।' কথাটা মনে ছিল নির্মলের। তার ওপর বাড়ির চাপে পড়তে এলেও মন তাঁর ছিল খুবই অশান্ত। তাই ওই ১৯০৯ সালেই তিনি দীক্ষা নিলেন, নিলেন শ্রীমা'র কাছ থেকেই।

কিন্তু দীক্ষা নিয়ে মন শান্ত হয় না। বরং ঈশ্বর চিন্তাটা আরো বাড়ে। সংসারের বন্ধন যেন তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয় তিনি আবার ঘর ছাড়েন। এবার তিনি চলে যান পুরীতে। সেটা ১৯০৯ সালের আগস্ট মাস। পুরীতে তখন ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তার কাছেই গেলেন নির্মল। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি বললেন, সংসার তার একদম ভাল লাগে না। তাই তিনি এসেছেন তাঁর কাছে। তিনি চান মুক্তির পথ।

এই মেধাবী অথচ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল যুবকটিকে ভাল লেগেছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেই মাদ্রাজেই। তাঁর এই আকুলতা যে সাময়িক একটা আবেগ নয় তাও বুঝেছিলেন তিনি। তাই তাঁর ঈশ্বর লাভের বাসনাকে রুদ্ধ না করে তিনি বরং দিলেন উস্কে। তিনি বললেন, মনে রেখ, ভগবানই শুভ, সংসার অশুভ।

কিন্তু আর সবের মত সময় না হলে যে ঈশ্বর লাভও হয় না, এগিয়ে যাওয়া যায় না। সাধন পথে তা আবারও প্রমাণিত হ'ল নির্মলের জীবনে। এবারও সংসার ছাড়া হ'ল না তাঁর। তাঁকে ফিরতে হ'ল কলকাতায়। সংসার ছাড়া না গেলেও প্রস্তুতিটা ভাল ভাবেই হয়ে গেল এই সূত্রে।

স্বামী মাধবানন্দ এ সম্পর্কে পরে বললেন, "তখন কলকাতায় একটা প্রাইভেট মেসে থাকতাম। স্বামীজীর 'ইন্সপায়ার্ডটকস্' আমার হাতে আসে। এই বই পড়ে আমার মনে বৈরাগ্যের আগুন আরো তীব্রভাবে জ্বলে উঠল। মনে হল, কি হবে এই ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে। কিছুদিন পরেই মঠে চলে এলাম আমি। এই তৃতীয় বার। এবার কিন্তু সাকসেসফুল।" নির্মল বেলুড় মঠে এসেছিলেন ১৯১০-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি।

মঠ থেকে কিন্তু নির্মলকে তাঁর এখানে আসার কথা বাড়িতে জানাতে বলা হ'ল।

নির্মলের কিন্তু ভয়, আবার যদি বাধা পড়ে, আবার যদি মঠে আসা না হয়। তাই কিছুতেই তিনি বাড়িতে চিঠি দেন না। কিন্তু তঁার মঠবাসকে চিরস্থায়ী করতেই যেন তঁার বাড়িতে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ।

চিঠি পেয়ে নির্মলকে নিতে এলেন এবার তার জেঠামশাই বৈদ্যনাথ বসু স্বয়ং। একটু কড়া ধাতের মানুষ তিনি, তারপর বাবুরাম মহারাজের মাষ্টারমশাই তাই তাঁর প্রভাবটাই ভাল খাটবে ভেবে এই ব্যবস্থা।

বৈদ্যনাথবাবু মঠে এসে নির্মলের খোঁজ করতেই বাবুরাম মহারাজ এলেন। সব শুনে মাষ্টারমশাইকে খুশি করতেই তিনি নির্মলকে বললেন বাড়ি ফিরে যেতে। ওদিকে আড়াল থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দ তাকে ইসারা করলেন বাড়ি না যাবার জন্য। এ এক বিচিত্র অবস্থা। নির্মল পড়লেন নিদারুণ সংকটে। শেষ পর্যন্ত বললেন, বাড়ি তিনি যাবেন কিন্তু জেঠামশাইয়ের সঙ্গে এক সাথে যাবেন না। নানা ভাবে বোঝানো হ'ল নির্মলকে, কিন্তু তঁার এক কথা। শেষ পর্যন্ত তঁার কথাতেই রাজি হতে হ'ল সবাইকে। নির্মলের তখন মনের কথা, আমি বৈরাগ্য পথের পথিক, গৃহ-জীবনের সঙ্গে নেই আমার কোন সম্পর্ক তাহলে কেন যাবো আমি গৃহীর সঙ্গে একসঙ্গে। এই জন্যই নির্মল সেবার এক ট্রেনেই বাড়ি গেলেও মাঝপথে আলাদা ভাবে টিকিট কেটে এবং আলাদা কামরায় চেপে গিয়েছিলেন বাড়ি।

বাড়িতে প্রথমে চলে একপ্রস্থ কান্নাকাটির পালা। নির্মল এবার বাবা-মা'র কাছে আস্তে আস্তে তুলে ধরে তঁার মানসিক অবস্থাটা। এবার কি জানি তাঁরাও বোঝেন, সব জিনিস সবার জন্য নয়। এ ছেলে ঘরে থাকার নয়। ঈশ্বর ভাবনায় নিবেদিত এর মন-প্রাণ। ওই পথেই সার্থক হবে তঁার জীবন। চোখের জলেই বিদায় দিলেন তাঁরা নির্মলকে।

নির্মলের এবারের স্থায়ী ঠিকানা বেলুড় মঠ। এই ১৯১০ সালেই নির্মল দ্বিতীয়বার যান জয়রামবাটিতে। এবার তিনি সাথী হিসেবে পান স্বামী বিরজানন্দকে। সেখানে কথায় কথায় মা একদিন বলেন, "ঠাকুরই সব। সাধন-ভজন সহজসাধ্য নয়; উহা মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া করিতে হয় এবং সংঘের কাজ ঠাকুরেরই সেবা।"

কথাটা মনে ধরল নির্মলের। বল পান তিনি মনে। প্রশান্তিতে ভরে যায় প্রাণ। খুঁজে পান তিনি মুক্তির প্রকৃত পথ। সংঘের সেবা এবং তার মাধ্যমে জনসেবা হ'ল তখন থেকে তঁার জীবনের ব্রত।

জয়রামবাটি থেকে নির্মলকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মায়াবতীতে। ১৯১১ সালে সেখানেই তঁাকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। চলে সাধন-ভজন।

১৯১২ সালে মাধুকরী নিয়ে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন নির্মল ব্রহ্মচারী। হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করে তিনি মনে মনে হন শান্ত; স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দেখতে দেখতে এল ১৯১৬ সাল। স্বামীজীর পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে নির্মল ব্রহ্মাচারীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। নির্মল হ'ন স্বামী মাধবানন্দ।

মাধবানন্দজী প্রথম যেদিন বেলুড় মঠে এসেছিলেন গৃহত্যাগের সংকল্প নিয়ে সেদিনই তাঁকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। সব কাজে তাঁকে আগলে রাখা এবং তাঁর কর্মপথে সাহায্য করার একটা দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন তিনি। তাই দেখি একসময় 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি হয়ে ওঠেন স্বামী শুদ্ধানন্দের সহকারী। তাঁর লেখায়, সম্পাদনায় সমৃদ্ধ হতে থাকে পত্রিকা।

১৯১৭ সালে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে আবার পাঠান হয় তাঁকে। ১৯১৮ সালে তাঁকেই করা হয় মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ওই পদেই। কলকাতায় অদ্বৈত আশ্রমের শাখা স্থাপনের মূলে ছিল তাঁরই প্রয়াস।

যাই হোক ১৯২৭ সালের মে মাসে তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকোতে বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ করে পাঠান হয়। ওইখানে তিনি ছিলেন ১৯২৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত। ওই অল্প সময়ের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু মানুষকে তিনি আকর্ষণ করেন বেদান্তের পথে।

১৯২২ সালেই স্বামী মাধবানন্দ আর স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে করা হয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ট্রাস্টি এবং পরিচালন সমিতির সদস্য। তাঁরা ছিলেন ট্রাস্টি ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের মধ্যে কনিষ্ঠ।

১৯২৭ সালে সানফ্রানসিসকো থেকে ফেরার পরই স্বামী মাধবানন্দকে করা হয় মঠ ও মিশনের সহকারী সাধারণ সম্পাদক। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। মাঝে অবশ্য ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত গেছে বিরতি। ওইসময় স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ওই পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে তিনি হন মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি। এবং ১৯৬২ সালের ৪ আগস্ট তাঁকে নির্বাচিত করা হয় মঠও মিশনের নবম সংঘগুরু।

স্বামী মাধবানন্দের কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। রাজকোটে রামকৃষ্ণ মঠের যে আশ্রম খোলা হয় তা প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন তিনি।

বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দের হিন্দী ভাষাতেও ছিল অসম্ভব

খেল। অদ্বৈত আশ্রম থেকে যে হিন্দী মাসিক পত্রিকা 'সমন্বয়' প্রকাশিত হ'ত তার সম্পাদক ছিলেন তিনিই। শুধু তাই নয়, 'কথামৃত'-এর হিন্দী অনুবাদ করে তা প্রকাশনাও করেন তিনি। 'হিন্দী গ্রামার অ্যাট এ গ্ল্যান্স' এবং 'বেঙ্গলী গ্রামার অ্যাট এ গ্ল্যান্স' তাঁর প্রতিভার আরেক সাক্ষর। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবর্ষে মিশন থেকে যে 'কালচারাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া' এবং মা সারদামণির জন্ম-শতবর্ষে যে 'দি গ্রেট ওমেন অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হয় তা সম্পাদনা করেন তিনি। ১৯৬০ সালের ৭ জানুয়ারি বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধনও করেন তিনি বেলুড়ে।

অসাধারণ মনীষার অধিকারী স্বামী মাধবানন্দের ভারতীয় শাস্ত্র সম্পর্কে ছিল স্বচ্ছ ধারণা। তার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত তাঁর সামনে। তাঁর সেই উপলব্ধি, সেই বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' সম্পর্কে শ্রীশঙ্কর ভাষ্যের ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে। শুধু একটিই নয়, বহু সংস্কৃত শাস্ত্র এবং গ্রন্থের তিনি করেন স্বাচ্ছন্দ্য, তথ্যনিষ্ঠ সহজ ইংরেজি অনুবাদ। তাঁর সাহিত্য প্রতিভার মূল্যায়ন একটি দুরূহ কর্ম। বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দী—তিনটি ভাষাতেই তিনি প্রকাশ করে গেছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে।

স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন নিবেদিত প্রাণ এক সন্ন্যাসী, স্বামীজীর বাণী ও আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবন দিয়ে। এ কারণে বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণকাজের সময় দেখা যেত তাঁর এক ভিন্নমূর্তি। নিজের জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রেখে তখন তিনি করে যেতেন কাজ। তাঁর সেই নিবেদিত অথচ সমাহিত জীবন দেখে মাথা নত হয়েছে বহু মানুষের।

আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ভাবধারায় তিনি এমনভাবে আত্মস্থ হয়েছিলেন যে বহু সময় মনে হ'ত তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলতেন যেন স্বয়ং তাঁরাই। এরকম একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন নিউইয়র্কের গ্রীক আর্ট ও হিস্ট্রির অধ্যাপক ডঃ জেরোম জে পলিট। ১৯৬১ সালে স্বামী মাধবানন্দ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান সেসময় কয়েক জায়গায় তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গী। তাঁর সেই সময়কার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে ডঃ পলিট বলেছেন, একদিন মিঃ মাকিট এবং ফিল গ্রিগসের (স্বামী যোগেশানন্দ) সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দকে নিয়ে তিনি চলেছেন, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টে। ইতিহাসের ছাত্র হওয়ার সুবাদে পলিট বলে যাচ্ছেন ইতিহাস সম্পর্কে নানা কথা। স্বামী মাধবানন্দ কিন্তু কোন মন্তব্যই করছেন না। এমনকি মনে হ'ল তিনি কোন কথাই শুনছেন না। উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন পলিট। একসময় তিনি চুপ করে যান। মকিট তাঁকে বলেন, কি হ'ল থামলে

কেন? ফিসফিসিয়ে বলেন পল্লিট, এসব কথা উনি শুনতে চান বা জানতে চান বলে তো মনে হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী মাধবানন্দ তাঁকে বলেন, কি হ'ল বলুন, দয়া করে থামবেন না। পলিট বুঝলেন, বাইরে শোনার কোন প্রতিক্রিয়া না ঘটলেও তিনি শুনছেন সব কিছুই।

আরেকদিনের কথা বলেন পলিট। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারে ভাষণ দিচ্ছেন স্বামী মাধবানন্দ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্তের অগ্রগতি সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি যেন হলেন উদ্দীপিত। তিনি বলে উঠলেন, এখানে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কেননা তাঁর আশীর্বাদের বাতাস সবসময় বইছে—আমাদের শুধু পাল খুলে দিতে হবে—তাহলেই কর্মতরী চলবে জলে দ্রুত। সেদিন স্বামী মাধবানন্দের বলা ওই ক'টি কথা সবাইকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। সবাই উপলব্ধি করতে থাকেন এক বিরাটের স্বরূপকে।

এই হলেন স্বামী মাধবানন্দ। তিনি বলতেন, "সুখে দুঃখে তারই দিকে চেয়ে থাকবে। আন্তরিক হলে তাঁর সাড়া পাবেই।"

যাঁরা তাঁর কাছে মুমুক্ষু হয়ে আসত তিনি তাঁদের স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, 'যদি সাধু হতে চাও তবে অনর্থক সময় নষ্ট করো না। বেশি বয়স হলে তখন শুধু হিসেবই মনে হবে।'

তাই বলে সবাইকে যে তিনি সংসার ছাড়তে বলতেন তাও নয়। বরং এব্যাপারে তাঁর বক্তব্য, "গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও যতটা সম্ভব নিজেকে শ্রীভগবানের চরণে বিকাইয়া দিবার চেষ্টা কর।" এই প্রসঙ্গেই এক ভক্তকে তিনি বলেন, "এইসবে বিবাহ করিয়াছ এখন সংসার ত্যাগের কথা বলিতেছ? ওকথা একেবারে ভুলিয়া যাও।"

সংঘগুরুর আসনে তিনি ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মত। কিন্তু তারই মধ্যে আপন কর্মতৎপরতা ও নিষ্ঠায় সংঘের প্রগতিকে করেছিলেন ত্বরান্বিত।

শরীর তাঁর বহুদিন ধরেই ভাল যাচ্ছিল না। ১৯৬১ সালে আমেরিকায় তাঁর একটি অস্ত্রোপচারও হয়। কিন্তু তাতেই তিনি পুরোপুরি সুস্থ হন না। অথচ ওই শরীর নিয়েও যুবকের উৎসাহে তিনি করে গেছেন কাজ।

অবশেষে এল ১৯৬৫ সালের ৬ অক্টোবর। শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীমা'র সন্তানের ছুটি নেবার পালা। যে মা সারদামণিকে তিনি বসিয়েছিলেন হৃদয়ের আসনে—যাঁর সম্পর্কে বলতেন, "তাঁহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার কথা মনে উঠে নাই। তাঁহার চরণতলে বাস করিতেছি ইহা ভাবিয়াই তৃপ্তি বোধ করিতাম"—সেই মাকেই তিনি স্মরণ করলেন তার মহাসমাধির সময়। তখন সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিট। মাধবানন্দজী উচ্চারণ করলেন দু'টি শব্দ—মা—মাগো। তারপরই লীন হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসাগরে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপং।
প্রকৃতিবিকৃতি শূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং
বিমলপরমহংসরামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

প্রভু, আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই প্রভু করে তুলব—প্রভু, আই শ্যাল মেক এ রিয়াল প্রভু অব ইউ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন পরমস্নেহভরে যাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন তিনি হলেন মঠের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ।

বয়সে সামান্য বড় হয়েও যিনি ছিলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দের সখা সেই ভরত মহারাজ (স্বামী অভয়ানন্দ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "খুব ডিসিপ্লিনড লাইফ ছিল ওর। সংঘের সকলের প্রতি ওর গভীর মমত্ববোধ ছিল। আসলে ওর স্বভাবটাই ছিল খুব স্নেহপ্রবণ। কখনও কারও সঙ্গে কটু ব্যবহার করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। স্বভাবে কোমল হলেও প্রভু মহারাজ আবার কঠোর হতে পারতেন। আমার মনে হয়, ওর মধ্যে সমদর্শী ভাবটা খুব ফুটে উঠেছিল। মায়াবতীতে, বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল একত্রে বাস করেছি আমরা। আমরা প্রায় সমবয়সীও। বরং ও আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোটই হবে। কিন্তু ওর প্রতি সব সময়েই একটা গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং আকর্ষণ বোধ করেছি আমি। যে কোন সমস্যায় আমার সঙ্গে পরামর্শ করত সে। অনেকবার একসঙ্গে বাইরে গিয়েছি। সবসময় আমাকে জিজ্ঞাসা করত, 'আপনি কখন বেরুবেন?' আমি বলতাম, 'সেকি! তুমি মঠের প্রেসিডেণ্ট। তুমি যখন বেরুবে, সকলে তোমাকেই 'ফলো' করবে। তুমি এরকম জিজ্ঞেস করবে না

আমাকে।' 'উত্তরে সে বলত, 'তা কি হয়? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ।' ওর এরক ব্যবহার আমাকে অভিভূত করেছে।''

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সম্পর্কে ভরত মহারাজের এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার গুণে যেমন সঠিক তেমনি অন্তরঙ্গ। কোমল ও কঠোরে মেশানো ছিল স্বামী বীরেশ্বরানন্দের চরিত্র। সদাপ্রসন্ন, শান্ত এই মানুষটি প্রয়োজনের মুহূর্তে অত্যন্ত কঠোর হতেও পারতেন। কিন্তু সেই কঠোরতার মধ্যেও ছিল এমন একটা মাধুর্য, এমন একটা আন্তরিকতা যে যার বিরুদ্ধে কঠোর হতেন তিনিও ঠিক আঘাত পেতেন না, বরং সে সব ক্ষেত্রে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্তও হতেন।

১৯৮৪ সালে বিহারের বন্যার সময়ে একজন সন্ন্যাসী এলেন মঠে। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সে সময় বন্যা দুর্গতদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে অভিভূত, তাদে ত্রাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তিনি। এমনি একটা সময়ে ওই সন্ন্যাসী এলেন তাঁর কাছে। সন্ন্যাসীটির মনের দীর্ঘদিনের বাসনা তীর্থ দর্শন এবং তপস্ করার। কিন্তু সংঘের একটার পর একটা কাজে যুক্ত থেকে তিনি নিজের জ ওই অবসরটুকু করে নিতে পারছেন না। তাছাড়া সংঘগুরুর অনুমতি এবং নির্দে না পেলে কোথাও যাবার উপায়ও নেই তাঁর। এবার তাই তিনি ঠিকই ক এসেছেন, গুরুজীর অনুমতি নিয়েই যাবেন এবার। মনের মধ্যে ওই আশাটু পুরে রেখে সন্ন্যাসীটি প্রণাম করেন বীরেশ্বরানন্দজীকে। তারপর খুব আ জানালেন তিনি তাঁর বাসনার কথা, আশীর্বাদ চাইলেন তাঁর।

সন্ন্যাসীর বাসনার কথা শুনে কঠোর হ'ল স্বামী বীরেশ্বরানন্দের মুখ। এক কড়া সুরেই বললেন তিনি, 'বিহারে অসংখ্য মানুষ আজ বন্যায় গৃহহারা, নিরাশ্রয় কয়েকদিন ধরে কত মানুষ—শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ—না খেয়ে রয়েছে। তাঁদের কা খাবার পৌঁছোচ্ছে না। আর তুমি যাবে তীর্থে, তপস্যা করতে? যাও বন্যাত্রা যাও।'

নারায়ণ বা শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে আদর্শের কথা প্রচার করে গেছে স্বামীজী—যে আদর্শ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে দিয়েছে আলাদা একটা মর্যাদা, (আদর্শ মিশনের কাজকে করেছে সম্প্রসারিত—সেই আদর্শ রক্ষায় বীরেশ্বরানন ছিলেন সদা সচেষ্ট। সে আদর্শ থেকে কাউকে সামান্য বিচ্যুত হতে দেখলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন, ক্রুদ্ধ হতেন। অথচ এই মানুষটিই আবার অন্য সময় স্নেহপ্রব মায়ের মত আগলে রাখতেন সবাইকে, নজর রাখতেন সবার সুবিধে অসুবিধে দিকে।

সেটা ছিল প্রচণ্ড গরমের একটা দিন। বীরেশ্বরানন্দজী তখন বেলুড় মঠের ধারণ সম্পাদক। কলকাতার কাছাকাছি এক শাখা কেন্দ্র থেকে চৈতন্যাখ্য চারী নামে একজন এসেছেন শেষ দুপুরে। বীরেশ্বরানন্দজীর কাছে তিনি সেছেন একটা বিশেষ কাজ নিয়ে। ব্রহ্মচারীটি তাঁর ঘরে এলেন। বীরেশ্বরানন্দ খলেন, ঘামে ভিজে জবজব করছে ব্রহ্মচারীটি। তিনি কোন কথা না বলে কে বসতে বললেন। তারপর এক কর্মীকে ডেকে ক'টা পয়সা দিলেন বরফ নার জন্য। তারপর দু'টা গ্লাসে চিনি দিয়ে সরবৎ করতে থাকলেন।

ব্রহ্মচারীটি ভাবেন, গরম কাল, তাই হয়ত মহারাজ খাবেন বলে ওই সরবৎ রছেন। ওদিকে বীরেশ্বরানন্দজী বেশ করে চিনি মিশিয়ে তাতে আধখানা লবুর রস মেশালেন। এদিকে কর্মীটি বরফ নিয়ে এসেছেন। বরফ ধুয়ে একটু 'ড়ো করে মেশালেন তিনি সরবতের সঙ্গে। তারপর একটি গ্লাস এগিয়ে দিলেন হ্মচারীটির দিকে।

ব্রহ্মচারীটি ততক্ষণে সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেলেন। তার সে অবস্থা দেখে রেশ্বরানন্দজী বলেন, কি হ'ল নাও ধর। ব্রহ্মচারীটি কোন রকমে গ্লাসটি নিয়ে লেন, মহারাজ, আপনি খাবেন না?

সে হবে এখন, এটা খাও তো।

কোনরকমে সরবতটা শেষ করে ব্রহ্মচারী। ততক্ষণে বীরেশ্বরানন্দজী অন্য গ্লাসের রবতটাও ঢেলে দেন তার গ্লাসে। ব্রহ্মচারীটির চোখ ফেটে তখন জল আসে। কাথায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক আর কোথায় তিনি একজন াধারণ ব্রহ্মচারী তার জন্যও এত দরদ, এত ভালবাসা। সেদিনের সেই ঘটনার থা বলতে গিয়ে এখনও চোখ ভরে আসে জলে সেদিনের সেই ব্রহ্মচারীর, াজকের এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর।

এই হলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে তাঁকে বলেছিলেন ামি তোমাকে সত্যিকারের প্রভু বানিয়ে ছাড়বো—তা তিনি এমনভাবেই নিয়েছিলেন। সাধন এবং সেবা দু'পথেই সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এগিয়ে য়ে গেছেন এই বিরাট রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে। ব্যবহারে, চরিত্রে আশ্চর্য মিল ক শিষ্যে। একইরকম কোমল হৃদয়—একইরকম সাধন নিষ্ঠা। আবার গুরুর তই তিনিও ছিলেন মঠের দীর্ঘদিনের অধ্যক্ষ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন ২১ বছর ার তিনি ১৯ বছর ছিলেন অধ্যক্ষ। এত দীর্ঘদিন আর কোন অধ্যক্ষের র্যকাল ছিল না। ১৯০১ থেকে ১৯৮৫ মঠের এই ৮৪ বছরের ইতিহাসে ১০ জন

অধ্যক্ষের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ আর বীরেশ্বরানন্দের কার্যকালের ব্যাপ্তি ৪০ বছর শিবজ্ঞানে জীবসেবা—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই ব্রতযজ্ঞে প্রথম এবং দশম- এই দুজনই প্রধান ঋত্বিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং দু'জনের সময়েই সংঘে ঐতিহাসিক বিবর্ধণ, সংকট এবং সংকট মোচনের অধ্যায়টি রচিত হয়েছে।

বিবেকানন্দের রাজা—ব্রহ্মানন্দের 'প্রভু' বীরেশ্বরানন্দ বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন পাঁচবছরের সে স্মৃতি তাঁর মনে থাকার কথাও নয়। তবু হয়ত সারাজীবনই তাঁ মনের গভীরে সযতনে লুকনো ছিল সে স্মৃতি। সে স্মৃতির কথা তিনি মুে বলতেন না, কিন্তু স্বামীজীর প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি আদর্শকে আত্মস্থ করে তাঁ প্রতিটি কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতেন স্বামীজীকে তিনি কতটা আপনার কে নিতে পেরেছিলেন। প্রথম দর্শনের সেই মুহূর্তটি নিয়ে জীবনরসিক বীরেশ্বরানন কিন্তু করতেন একটি সরস দার্শনিক মন্তব্য। তিনি বলতেন, স্বামী বিবেকানন্দকে আমি দেখিনি, তবে বিবেকানন্দ আমাকে দেখেছেন। কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয় সেদিন মাদ্রাজে দর্শনার্থীর কোলে পাঁচ বছরের পাণ্ডুরঙ্গের পূর্ণদৃষ্টে স্বামীজীবে দেখার কথাও নয়, সেদিন সেই মুহূর্তেই স্বামীজী তাঁর পূর্ণদৃষ্টিতে দীক্ষিত করেছিলেন সেই শিশুকে, চিহ্নিত করেছিলেন ভবিষ্যৎ সংঘনায়ক হিসেবে। সেই দৃষ্টিপাতে পূতপবিত্র বীরেশ্বরানন্দ তাই সংঘকে অত দীর্ঘদিন ধরে সঠিক অথচ পুণ পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ—আর স্বামী বীরেশ্বরানন্দ—প্রভু আর সন্তান। সে কারণেই বিবেকানন্দের কাছে তাঁর আলাদা করে চাইবার কিছু ছিল না। তাঁর বাণীর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেযেছিলেন তাঁর পথ—ওই পথেই তিনি পেয়েছিলেন আনন্দ—তাইতো যখন সেই বীরেশ্বর-এর সঙ্গে আনন্দ যুক্ত করে তাঁর নাম রাখা হ'ল বীরেশ্বরানন্দ তখন তাঁর চেয়ে খুশি হননি আর কেউ। ঠাকুরের মানস সন্তান —গুরুর জীবন নির্দেশকের নামটি আত্মসাৎ করতে পেরে ভেসেছিলেন এক অনন্ত আনন্দসাগরে।

সদানন্দময় ছিলেন এই পাণ্ডুরঙ্গ প্রভু। তিনি নিজে থাকতেন আনন্দে— অন্তপ্রাণে ছড়িয়ে দিতেন আনন্দের প্রবাহ। সব সময় তাঁর একান্ত কামনা থাকত সবাই আনন্দে থাকুন, উপভোগ করুন আনন্দময় ঈশ্বরকে।

সেবার তিনি গেছেন পাটনা আশ্রমে। প্রতিরাতেই খাওয়া দাওয়ার পর তাঁর ঘরে হ'ত সাধু ব্রহ্মচারীদের ক্লাস। সেদিনও রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। ক্লাস শুরু হতে তখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি। বীরেশ্বরানন্দ তাঁর ঘরে রয়েছেন আর

অন্য ব্রহ্মচারীরা ঘরের সামনে বারান্দায় বসে নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করছেন, হাসছেন হো হো করে। তাঁদের সেই নির্মল উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখর হয়ে উঠেছে চারিদিক। বীরেশ্বরানন্দজীর ঘরে তখন ছিলেন এক ব্রহ্মচারী। তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল এই হাসিতে ব্যাঘাত হচ্ছে মহারাজের বিশ্রামের। তাই তিনি বাইরে এসে অন্য ব্রহ্মচারীদের বললেন, এই চুপ! চুপ! মহারাজের অসুবিধে হচ্ছে।

মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল হাসি। মহারাজের অসুবিধে হচ্ছে শুনে তাঁরা বেশ সঙ্কুচিতও হলেন।

ওদিকে বীরেশ্বরানন্দ ঘর থেকে দেখছিলেন সবকিছু। তিনি ব্রহ্মচারীটিকে ডেকে বললেন, কি হ'ল, তুমি ওদের বারণ করলে কেন? বেশ তো সবাই আনন্দ করছিল, আমিও আনন্দ পাচ্ছিলাম। কে তোমাকে বারণ করতে বলেছিল? আমি তো বেশ আনন্দেই ছিলাম। ব্রহ্মচারীটি মাথা নিচু করেন। আসলে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মনে করতেন, শুষ্ক হৃদয় নিয়ে কিছুই করা যায় না। সব সময় হৃদয়টাকে ভরিয়ে রাখতে হবে রসে—সেটাই সাধনা, মোক্ষ লাভের সবচেয়ে সহজ উপায়।

বীরেশ্বরানন্দজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষ না হলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসে না—এলেও ভোগ করা যায় না। এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বীরেশ্বরানন্দজী প্রায়ই শোনাতেন বিবেকানন্দের একটি উক্তি। পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পথে মাদ্রাজে কয়েকজন যুবক স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা স্বামীজী, আপনি রাজনীতিতে আসছেন না কেন? রাজনীতিতে এসে দেশকে স্বাধীন করার জন্য চেষ্টা করছেন না কেন? উত্তরে স্বামীজী বললেন, আমি কালই তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিতে পারি; কিন্তু তোমরা কি রাখতে পারবে? মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরি কর। তখন স্বাধীনতা আপনি আসবে।

সংঘগুরু হয়েও, সংঘকে বহু বিস্তৃত করে তোলেন তিনি। ওই সঙ্গে যখনই দেখতেন দেশের যুবসমাজ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘোরাফেরা করছে,কোন ব্যাপারেই আন্তরিক নয়, উৎসাহীও তেমনি নয়, অমনি তিনি মানসিক অস্বস্তিতে ভুগতেন, ব্যথার একটা হিমস্রোত তাঁর সব স্নায়ুকে যেন স্তব্ধ করে দিত। তাই সংঘকে সাময়িক নানা সংকট থেকে উত্তরণের পর তাকে যখন করেন সুস্থিত, তখনই যুবসমাজের আত্মিক উন্নতির জন্য এক আন্দোলন গড়ে তোলায় মন দেন তিনি। মঠ ও মিশনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ও উৎসাহে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হতে থাকে

যুবসম্মেলন। সেসব সম্মেলনে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে দেশের আগামী প্রজন্মকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন, যেখানে কোন কারণে উপস্থিত হতে পারেননি, সেখানেও স্বামীজীর বাণী পাঠিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন সবাইকে, তিনি বলতেন, দেশের বর্তমান দুর্দশা থেকে বাঁচতে হলে স্বামীজীর প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ। সুতরাং তাঁর কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। অন্যত্র পথ নির্দেশ খুঁজতে যাওয়া সময়ের অপচয় মাত্র। ভারতবর্ষকে ভারতীয় আদর্শেই গড়ে তুলতে হয়— যে আদর্শের কথা স্বামীজী বলে গেছেন। তোমরা স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' পাঠ কর এবং তার ভাব ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হও। সে সব বিদেশি চিন্তা ভাবনা ও আদর্শের তুলনা করে দেখ এবং এদেশের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের জন্য যথার্থ পথ নির্ধারণ কর।

ছাত্র যুবকদের তিনি বলতেন, স্কুল কলেজ অথবা সংসারজীবনে প্রবেশের আগে অন্তত একটি বছর দেশের পিছিয়ে পড়া অনুন্নত, দরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। তাহলে বাস্তবিক অর্থেই দেশের পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে। তিনি বলতেন, স্বামীজী তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে গিয়েছেন। আরও বলে গিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু চিন্তা ভাবনা করেছেন তা তিনি যুবকবৃন্দের উপর অর্পণ করে দিয়েছেন। উত্তরাধিকারীরূপে তারা স্বামীজীর পরিকল্পিত এসব কাজের দায়িত্ব বহন করবে, এ আশা তিনি পোষণ করতেন। আশা করি, তোমরা স্বামীজীকে নিরাশ করবে না। সেই জন্য আজ তোমরা সঙ্কল্প গ্রহণ কর যে, স্বামীজীর কাজে তোমরা লেগে যাবে, আর স্বামীজী যে পথে ভারতবর্ষকে নিয়ে যেতে বলেছেন সেই পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বামীজীর আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা।

যদিও স্বামী বিবেকানন্দকে দেখার ছবিটি তাঁকে এঁকে নিতে হয়েছে অন্যের কথা শুনে তবু তিনি নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করেছিলেন স্বামীজীর ভাবনা চিন্তার মধ্যে। ঠাকুর ছিলেন তাঁর জীবন দেবতা। আর স্বামীজী ছিলেন তাঁর চিন্তা রাজ্যের অধীশ্বর। স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর এই অনুরাগের কাহিনীটিও বড় সুন্দর।

স্বামীজীকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোন একটি দিনে। স্বামীজী পাশ্চাত্য বিজয়ের পর সদ্য ফিরেছেন ভারতে। মাদ্রাজে তিনি তখন আসেন বিলিগিরি আয়েঙ্গারের 'ক্যাসেল কার্ণানে'। প্রতিদিন কত

যে মানুষ আসছে তাঁকে দেখতে তার ঠিক নেই। সেদিন দর্শনার্থীদের মধ্যে ছিলেন এক ভদ্রলোক, কোলে তাঁর বছর পাঁচেকের একটি ছেলে। সেদিন স্বামীজীকে ভাল করে দেখার বা বোঝার মত মন তার ছিল না। কিন্তু স্বামীজীর সেই প্রজ্ঞা ও দিব্যদৃষ্টির আশীর্বাদ শিশুটি সেদিন পেয়েছিল। শিশুটির নাম পাণ্ডুরঙ্গ প্রভু। পরবর্তীকালের প্রভু মহারাজ বা স্বামী বীরেশ্বরানন্দ।

কর্ণাটকের দক্ষিণ কানাড়ার ছোট একটি শহর গুরুপুর। ওই শহরে উনিশ শতাব্দীর শেষাশেষি কয়েকঘর সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। তাঁরা নাকি এসেছিলেন গৌড় বা বঙ্গদেশ থেকে। সম্ভবত গুরুগিরি করার সূত্রে এই শহরে তাঁদের আগমন এবং তা থেকেই শহরের নাম হয়েছে গুরুপুর।

থাক সে প্রসঙ্গ। এই গুরুপুরেই থাকতেন কৃষ্ণ প্রভু। সারস্বত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ প্রভুর অন্যান্য ভাইরা গুরুপুরে ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও কৃষ্ণ প্রভু ছিলেন বেশ উচ্চশিক্ষিত। তিনি ছিলেন গুইণ্ডি কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, তাই তিনি সপরিবারে থাকতেন মাদ্রাজে। এই মাদ্রাজেই ১৮৯২ সালের ৩১ অক্টোবর পাণ্ডুরঙ্গের জন্ম। মা নেত্রাবতী বাঈ। চার ভাই বোনের মধ্যে পাণ্ডুরঙ্গ ছিলেন তৃতীয়। সবার বড় এক দিদি তারপর তাঁরা তিন ভাই। প্রভু পরিবার ছিল অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ। কুলদেবতা বেঙ্কটেশ্বরের প্রতি ছিল তাঁদের অচলা ভক্তি।

পাণ্ডুরঙ্গের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তিনি হারান মা-কে। ওই বয়স পর্যন্ত তিনি কোন কথা বলতে পারতেন না। তাই সবাই ধরেই নিয়েছিল পাণ্ডুরঙ্গ হয়ত মূক—কথা বলার শক্তি তার নেই। কিন্তু হঠাৎ-ই একদিন কথা বলতে শুরু করেন পাণ্ডুরঙ্গ। স্বাভাবিক সেসব কথাবার্তা। আর পাঁচটা শিশু থেকে তখন তাঁকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। শুধু একটু গম্ভীর ভাবুক প্রকৃতির এই যা।

পাণ্ডুরঙ্গের দশ বছরের মত বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ততদিনে দিদি লীলাবতীরও বিয়ে হয়ে গেছে। প্রায় অনাথ পাণ্ডুরঙ্গ এবং তাঁর অন্য দুই ভাইকে ম্যাঙ্গালোরে নিয়ে এলেন তাঁদের মামা বাবুরাও নায়ক। ভাগ্নেদের তিনি ছেলের চেয়ে বেশি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে পালন করতে থাকেন।

মাদ্রাজে থাকতেই শুরু হয়ে গেছে পাণ্ডুরঙ্গের পড়াশোনা। সেখানে তিনি পড়তেন স্যানথম উচ্চবিদ্যালয়ে এবং হিন্দু উচ্চবিদ্যালয়ে। ম্যাঙ্গালোরে এসে তিনি ভর্তি হলেন কানাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে। এনট্রান্স পাশ করেন তিনি ওই কলেজ থেকেই। এফ এ পাশ করেন ম্যাঙ্গালোর সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে এবং ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। স্নাতক স্তরে পাণ্ডুরঙ্গের অন্যতম বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা।

বি এ পড়ার সময়ই ম্যাঙ্গালোর কানাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ডেমনসট্রেটর অসুস্থ হয়ে পড়লে মাস তিনেক তাঁকে ওই স্কুলে শিক্ষকতাও করতে হয়। যাই হোক পাণ্ডুরঙ্গ মাদ্রাজ থেকে স্নাতক হয়ে ত্রিবান্দ্রমে যান আইন পড়তে। প্রায় এই সময়েই ঘটল তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তনের ঘটনাটি।

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি পাণ্ডুরঙ্গের ছিল একটা আকর্ষণ। শুধু আকর্ষণ বললে ভুল বলা হবে, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ খেলোয়াড়। ক্রিকেটে তিনি তো কলেজ টিমের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল টেনিস। আর এই টেনিসই ঘুরিয়ে ছিল তাঁর জীবনের গতিপথকে নতুন এক খাদে। তাঁর নিজের কথায়, "বি এ পরীক্ষার পর ম্যাঙ্গালোরে এসেছি, তিন বন্ধু মিলে আমরা সন্ধ্যায় কানাড়া হাইস্কুলে টেনিস খেলতে যেতাম। একদিন টেনিস খেলে ফিরছি, বন্ধুদের মধ্যে একজন (তার নাম জনার্দন মালয়) পথে তার কাকার বাড়িতে গেল কাকার লাইব্রেরী থেকে একটা বই আনতে। বইটা আমিই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশত বইটা তখন লাইব্রেরীতে না পাওয়ায় বন্ধুটি অন্য একটি বই আমার জন্য নিয়ে আসে। বইটি হ'ল স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি রচনাবলীর প্রথম খণ্ড। ওই বইটি আমি প্রথম দেখলাম এবং আমার ও'টি পড়ার কোন আগ্রহও ছিল না। কিন্তু বন্ধুটি প্রায় জোর করেই বইটি আমাকে দিয়ে পড়বার জন্য বারবার অনুরোধ করল। অগত্যা বইটি নিলাম। কিন্তু না পড়েই বাড়িতে রেখে দিলাম, ওদিকে বন্ধুটিও নাছোড়বান্দা। রোজই আমাকে জিজ্ঞেস করত বইটা পড়েছি কিনা। শেষে একদিন ওকে খুশি করার জন্যই বইটি খুললাম এবং পড়তে এত ভাল লাগল যে সবটাই পড়ে ফেললাম। বইটি পড়ে আগ্রহ এত বেড়ে গেল যে সোজাসুজি চিঠি লিখে বসলাম মায়াবতীতে। সেখান থেকে উত্তরও পেলাম। উত্তর দিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী। তিনি তখন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। তিনি আমাকে মাদ্রাজ মঠের ঠিকানা দিয়ে সেখানকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। কলেজে পড়ার সময় মাদ্রাজ মঠের কাছাকাছি থাকলেও মঠ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।"

সেটা সম্ভবত ১৯১৪ সাল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের পরামর্শমত যোগাযোগ করলেন মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে। শুরু হ'ল যাতায়াত। স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলেন নানা গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে। ওদিকে বি এ পাশ করে ত্রিবান্দ্রমে আইন পড়াও চলছে। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের আবরণ

খসে গিয়ে বৈরাগ্যের যে রঙটা গভীর হয়ে উঠেছে তাকে মুছে ফেলতে পারেন না আর। মানসিক একটা যন্ত্রণার মধ্যে শ্যাম রাখি, না কুল রাখি অবস্থায় স্থির হলেন তিনি। ত্রিবান্দ্রমে আইনের পড়া শেষ না করেই চলে এলেন মাদ্রাজ মঠে। মঠের অধ্যক্ষ তখন স্বামী সর্বানন্দ।

পাণ্ডুরঙ্গের মঠে যোগ দেবার খবর পেয়েই মামা ছুটে এলেন। দিদিমা তখনও বেঁচে। মা-হারা নাতিটির মতিগতির কথা শুনে হায় হায় করছেন তিনি। মামা বাবুরাও নানাভাবে বোঝাতে থাকেন ভাগ্নেকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পাণ্ডুরঙ্গকে আবার ত্রিবান্দ্রমে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। আইন পড়া চলতে থাকল।

পাণ্ডুরঙ্গের কিন্তু নিজেকে খাঁচার পাখি বলে মনে হতে থাকল। মুক্ত আকাশের জন্য তাঁর ছটফটানি গেল বেড়ে। শেষ পর্যন্ত আইন পরীক্ষা না দিয়েই ১৯১৬ সালে পাণ্ডুরঙ্গ আবার চলে এলেন মাদ্রাজ মঠে। যোগ দিলেন সেখানে ব্রহ্মচারী রূপে। বয়স তখন তাঁর বছর চব্বিশ। মঠে যোগ দিলেন, কিন্তু মামার ভয়টা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। তাই মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষর অনুমতি নিয়ে তিনি চলে গেলেন বেলুড়ে।

পথ-ঘাট না চেনার বাধা অতিক্রম করে তিনি যখন মঠে ঢুকলেন-মহাপুরুষ মহারাজ তখন দুপুরের খাওয়া সেরে মুখ ধুচ্ছেন। পাণ্ডুরঙ্গকে তিনি গ্রহণ করলেন সাদরে। মঠে মাস দুয়েক থাকার পর বাবুরাম মহারাজ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন জয়রামবাটিতে শ্রীশ্রীমা'র কাছে দীক্ষা নেবার জন্য। সেটা ১৯১৬ সালের জুন মাস। এক ভদ্রলোক জয়রামবাটি যাচ্ছিলেন, বাবুরাম মহারাজ তাঁরই সঙ্গী করে দিলেন পাণ্ডুরঙ্গকে। তখন জয়রামবাটির পথ ছিল দুর্গম—যানবাহনের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। তিন তিনটে দিন লাগত তখন কলকাতা থেকে জয়রামবাটি যাতায়াতে।

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। তাই কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে না করে তাঁরা পৌঁছলেন জয়রামবাটিতে। তাঁর স্মৃতিচিত্রণে, জয়রামবাটি পৌঁছোলাম বেলা চারটা-সাড়ে চারটা নাগাদ। এখন যাকে মায়ের নতুন বাড়ি বলা হয় সেটি তখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। তার সংলগ্ন বাইরের দিকটায় যে বৈঠকখানা সেখানে পুরুষ ভক্তরা কেউ এলে থাকতে দেওয়া হ'ত। আমাদেরও সেখানে থাকতে দেওয়া হ'ল। মা তখন থাকতেন পুরনো বাড়িতে। আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বাড়ির উঠোনে ঢুকে দেখি মা বারান্দায় বসে রাতের রান্নার জন্য তরকারি কাটছেন। আর কেউ তখন সেখানে ছিল না। পুরুষরা আসছে বলে বোধহয় মেয়েরা সব সরে

গিয়েছিল। আমরা মাকে প্রণাম করলাম। আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি মাকে স্বামী প্রেমানন্দজীর (বাবুরাম মহারাজ) চিঠির কথা বললেন। মা একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন চিঠিটা পড়ে তাঁকে শোনাতে। চিঠি পড়া হলে মা বললেন, বেশ কালই ওদের দীক্ষা হবে। আমরা নতুন বাড়ির বৈঠকখানায় ফিরে এলাম।

পরদিন আমরা দীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকলাম। মা সকালবেলা ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষার জন্যে আমাদের এক এক করে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের দীক্ষা হয়ে গেল।'

দু'একদিন মায়ের সঙ্গ করে পাণ্ডুরঙ্গ ফিরে এলেন আবার বেলুড়ে। মহাপুরুষ মহারাজ আর বাবুরাম মহারাজের সান্নিধ্যে বেশ সুন্দরভাবে কাটছিল দিন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে কর্মী করে আবার মাদ্রাজেই পাঠিয়ে দিলেন। ততদিনে পাণ্ডুরঙ্গ মামাকে সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। মামা এবার বুঝলেন, ঈশ্বরের আহ্বান সুর তুলেছে যার অন্তরে তাকে ঘরে রাখা অসম্ভব। তাই তিনি মেনে নিলেন পাণ্ডুরঙ্গের সিদ্ধান্তকে। নিশ্চিন্ত পাণ্ডুরঙ্গ ফিরে এলেন মাদ্রাজ মঠে।

মাদ্রাজ মঠের আর্থিক অবস্থা তখন মোটেই ভাল নয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হয় কর্মীদের। এই সঙ্গে চলে সাধন ভজনও। এর মধ্যে মহাপুরুষ মহারাজ এলেন মাদ্রাজে। ১৯১৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ঠাকুরের জন্মতিথির দিন তিনি ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করলেন পাণ্ডুরঙ্গকে। নাম হ'ল তার ব্রহ্মচারী সিদ্ধচৈতন্য। এর তিন বছর বাদে ১৯২০ সালের ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর তিথি পূজার দিন ভুবনেশ্বর মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাস দিলেন তাঁকে। পাণ্ডুরঙ্গ হলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য সন্ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই বীরেশ্বরানন্দের মাদ্রাজ যাওয়া হ'ল না। শরীর সারানোর জন্য তাঁকে পাঠানো হল বারাণসী সেবাশ্রমে। সেখানে থেকে সুস্থ হয়ে উঠে তিনি যান বারাণসীর পাশেই অদ্বৈত আশ্রমে।

১৯২১ সালে বীরেশ্বরানন্দ কর্মী হিসেবে যোগ দেন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে। সেখানে কয়েক বছর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পর তাঁকে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কলকাতা শাখার ম্যানেজার করা হয়। তাঁর কর্ম দক্ষতার গুণেই প্রচার বাড়তে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সাহিত্যের। ১৯২৭ সালে তিনি হন অদ্বৈত আশ্রমের অছি, ও' বছর ১৪ এপ্রিল হন আশ্রমের অধ্যক্ষ। ওই পদে তিনি ছিলেন ১০ বছর। ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে

'প্রবুদ্ধ ভারত'এ যে মূল্যবান সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় তার মূল কৃতিত্ব বীরেশ্বরানন্দজীরই। ১৯২৯ সালে তিনি হন মঠ ও মিশনের অছি এবং পরিচালন পরিষদের সদস্য।

১৯১৬ সালে তিনি অনন্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন আর এই জীবনের খেলা শেষ করে ফিরে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণলোকে। এই দীর্ঘ ৬৯ বছরের মধ্যে একটি বছর ছাড়া আর কোন সময় কিন্তু তাঁরই জন্য খরচ করেননি, স্বপ্নেও ভাবেননি কর্ম থেকে অবসার নেবার কথা। 'ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্কশপ' বা কর্মই সাধনা—শিবজ্ঞানে করতে হবে জীবসেবা—স্বামীজীর এই আদর্শকে সামনে রেখে তিনি এগিয়েছিলেন আপন লক্ষ্যে।

অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষর পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে তিনি ১৩৩৭সালের এপ্রিলে চলে যান হৃষীকেশে তপস্যার জন্য। কিন্তু তারও মধ্যে ২০ অক্টোবর কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দ মুসৌরীতে দেহত্যাগ করলে তিনি সেখান থেকে তাঁর মরদেহ কনখলে নিয়ে এসে নীলধারায় জলসমাধি দেন। ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হয় সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য পরিচালনার জন্য তিনি আসেন। ওই সময়ই নিযুক্ত হন মঠ ও মিশনের সহসম্পাদক পদে। মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বীরেশ্বরানন্দকে এবার চলে আসতে হ'ল মঠের সদর দপ্তর বেলুড়ে। কিন্তু পরের বছরই তাঁকে যেতে হয় বারাণসীতে সেখানকার আশ্রমের কর্মধারা পুনর্বিন্যাসের জন্য। বছর দুয়েক বারাণসীতে থেকে ওড়িশা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, সিংহলে মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কার্যালয় পরিদর্শন করে আবার ফিরে আসেন বেলুড়ে।

ধৈর্য, সংযম, বুদ্ধি ও সংগঠনশক্তির সাহায্যে তিনি মিশনের বিভিন্ন ত্রাণকাজ যেভাবে চালিয়েছেন সেটা সংঘের ইতিহাসে সংযোজন করেছে একটি চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের।

আসলে বীরেশ্বরানন্দের হৃদয়ে 'কর্মই সাধনা' স্বামীজীর এই উক্তি এত গভীর ছাপ ফেলেছিল যে তিনি চিরটা কাল সব কাজ করে গেছেন ঈশ্বর আরাধনার মনোভাব নিয়ে। যখন যা করেছেন সবই করেছেন সংঘের জন্য আর মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন সংঘের সেবা করার অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণেরই সেবা করা। সংঘের সামগ্রিক কল্যাণই তাই তাঁর লক্ষ্য। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা লোভ তাঁর কাজকে কোনদিন করতে পারেনি এতটুকু ছোট। একারণেই সংঘের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী

স্মৃতিচারণে তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'সংঘের ভাল হবে বলে তিনি যেটা বুঝতেন সেটা ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ বা উচ্চাশা ছিল না।'

সংঘের এই সামগ্রিক উন্নতি করার কাজে তিনি সব সময় প্রবীণদের পরামর্শ নিতেন। কাজ করতেন অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সঙ্গে। একারণেই কর্তৃপক্ষের মধ্যে যাঁরা প্রবীণতর তাঁরাও পরামর্শ নিতেন তাঁর। তাঁর সিদ্ধান্তকেই মনে করতেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। স্বামী মাধবানন্দ যখন সাধারণ সম্পাদক তখন কোন সাধু সন্ন্যাসী তাঁর কাছে কোন পরামর্শ নিতে এলে তিনি বলতেন, "প্রভুর সঙ্গে কথা বল। ও কি বলে শোন।" সবরকম সংঘাত, সংঘর্ষ এড়িয়ে সকলকে নিয়ে করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। প্রবীন সন্ন্যাসীদের মতে সকলকে নিয়ে কাজ করার আর্ট বা শৈলীটা জানা ছিল তাঁর। এক সুমধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। সেই ব্যক্তিত্বের জন্যই ১৯৪৯ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫১ সালের মার্চ পর্যন্ত তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দের অনুপস্থিতে তাঁকে করতে হয় সাধারণ সম্পাদকের কাজ। আবার ১৯৬১ সালের ৭ এপ্রিল মাধবানন্দজী চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলে তাঁকে আবার নিতে হয় সাধারণ সম্পাদকের কার্যভার। ১৯৬৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সংঘগুরু হবার আগে পর্যন্ত বীরেশ্বরানন্দকে ওই কাজই চালিয়ে যেতে হয়।

নতুন কিছুকে গ্রহণ এবং উপলব্ধি করার আবার পুরাতন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা ছিল বীরেশ্বরানন্দের সহজাত ক্ষমতা। নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন করে দিতে পেরেছিলেন সংঘ ও মিশনের মধ্যে। তাই যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই তিনি প্রচার করেছেন ঠাকুর স্বামীজী এবং শ্রীমা'র বাণী, তুলে ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অনন্য বৈশিষ্ট্যকে। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'বুদ্ধ'-মূর্তি, 'শ্রীমা' ছিলেন 'সংঘস্বরূপিনী' এবং স্বামীজী ছিলেন 'ধর্ম' স্বরূপ। এই ত্রিরত্ন এবং তাঁদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি বারবার বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপনের জন্য এসেছিলেন। তিনি বাণী দিয়ে গেছেন এবং ধীরে ধীরে সারা জগতেই, এমন কি আশা করা যায় না এমন সব জায়গাতেও সে বাণী কাজ করে চলেছে। এতেই বোঝা যায়, তাঁর চিত্ত আলোড়নকারী বাণীর জন্য মানুষের কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ রয়েছে। যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে জগতের ওপর ক্রিয়াশীল করা হয়েছে, তার মধ্যে নবযুগ প্রবর্তনের শক্তি ও সম্ভাবনা নিহিত। পুরাতন যুগ যাচ্ছে, নতুন যুগ আরম্ভ হচ্ছে, সেই সন্ধিক্ষণে বাস করছি আমরা।'

গুরুবাদ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যরা সংঘে একটি বিশেষ ঐতিহ্য সৃষ্টি

করেছিলেন। তাঁরা বলতেন, মানতেন অন্যকে মানার জন্য বলতেন একটি কথা, আমাদের ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ, আসল গুরুও তিনি—দীক্ষা সে যে কোন ব্যক্তিগুরুর কাছেই হোক না কেন। এই ঐতিহ্য রক্ষায় বীরেশ্বরানন্দজীও সচেষ্ট ছিলেন সব সময়। এ কারণে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গোপনে রেখেছিলেন তাঁর জন্ম-তারিখ। মঠের হিসেব অনুযায়ী তাঁর দীক্ষিত সন্তানের সংখ্যা ৭৫ হাজার। একজন সংঘগুরুর কাছে দীক্ষিতের সংখ্যা হিসেবে এটাই সর্বাধিক। শুধু এঁরাই নন, এই সংখ্যার বাইরেও রয়েছে দেশে ও বিদেশে এক বিরাট সংখ্যা যাঁরা পেয়েছেন তাঁর কৃপা, আশ্রয়। অথচ এর জন্য কোন সময় তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়নি আমিত্বের। বরং তাঁর আশ্রিতের সংখ্যা যত বেড়েছে ততই শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের আদর্শকে তিনি তুলে ধরেছেন উঁচুতে। তিনি বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ আর পাঁচটা মঠের মত শুধুই ঈশ্বর উপাসনার জন্য নয়, এ মঠ ঈশ্বরলাভের জন্য উপাসনা যেমন চালিয়ে যায়, তেমনি পীড়িত, নিগৃহীত মানবতার সেবায় এগিয়ে যাওয়াটাকে তাঁরা মনে করেন অবশ্য কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নয়, এর মধ্যে দিয়ে যে ঈশ্বর লাভ করা যায় এই সত্যে তাঁরা বিশ্বাসী।'

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সুন্দর ভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'আমাদের দেশে প্রত্যেক অবতারকল্প পুরুষ আচার্য মহাপুরুষের জন্মের পর একটি করে মঠ স্থাপিত হয়। সেখানে তাঁদের ভক্ত ও শিষ্যেরা থাকেন এবং তাঁদের আদেশ উপদেশ প্রচার করেন। এবার ঠাকুর স্বামীজী যে মঠ স্থাপন করলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এটা কি ঠিক সেইরকম, না আগের মঠগুলি থেকে এর কিছু পার্থক্য আছে? আছে। যেসব মঠ হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ; স্বামীজী যে মঠ করে গেছেন তারও মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। ঠিক এদিক থেকে কোন পার্থক্য নেই; আমাদের সনাতন যে আদর্শ তা ঠিকই আছে। কিন্তু সাধারণ মঠ থেকে স্বামীজীর মঠের একটু পার্থক্য ও আছে। আগের সব মঠে মঠবাসীরা শুধু জপ ধ্যান করতেন, পূজা শাস্ত্রপাঠ আলোচনা করতেন, ভক্তদের তা থেকে উপদেশ দিতেন—বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ওইটুকু মাত্র, সমাজের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বামীজী এর একটু পরিবর্তন করেছেন দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য মঠবাসীদের সবরকম কাজ করতে হবে, রোগীর সেবাশুশ্রূষা করতে হবে, যারা অশিক্ষিত তাদের শিক্ষা দিতে হবে—এরকম নানাবিধ কাজ করে সমাজকে আবার ভাল করে গড়তে হবে। জপধ্যানের সময় আমরা যে ভগবানের চিন্তা করি, তিনিই মানুষ হয়ে রয়েছেন—এ বুদ্ধি নিয়ে সেবা করলে সেই সেবায় ভগবানের ধ্যানও হয়ে যায়;

তাহলেই ভগবানের পুজায়, তাঁর ধ্যানে এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে মানুষের সেবায় কোন প্রভেদ আর থাকে না, সব সময়ই ভগবানের চিন্তাতেই লিপ্ত থাকতে পারি।'

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ তাঁর সুযোগ্য পৌরোহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্মক্ষেত্রকে আজ করেছেন আরো প্রসারিত, মানবসেবার ধারণাটি হয়েছে সুবিস্তৃত, মিশনের ভিত্তিভূমি হৃদয়ে আরো দৃঢ়। মঠ ও মিশনের গত ৫০ বছরের ইতিহাসে যত স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে স্মরণীয় মঠও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন। বীরেশ্বরানন্দজীর আগ্রহেই প্রথম সম্মেলনের (১৯২৬) ৪৪ বছর পরে ১৯৮০ সালের ২৩ ডিসেম্বর হয় দ্বিতীয় মহাসম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, "আমি এখানে 'সংঘ' শব্দটি বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করছি। সাধারণতঃ সন্ন্যাসীদের সংস্থা প্রসঙ্গেই 'সংঘ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমি এখানে গৃহী ও অন্যান্য অ-সন্ন্যাসী ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত করছি।" তিনি বলেন, "রামকৃষ্ণ সংঘ শুধু সাধু ব্রহ্মচারীদের নিয়ে নয়, শুধু দীক্ষিত ভক্তদের নিয়ে নয়, যারাই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী মা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ও অনুরাগ সম্পন্ন তাদের সকলকে নিয়ে এই সংঘ এবং সেই বিরাট সমষ্টিই সংঘ শরীর।"

শুধু দেশের শিক্ষা নয়, আন্তর্জাতিক শিক্ষা ভাবনার সঙ্গে ও স্বামীজীর শিক্ষা ভাবনা ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি গঠন করেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পর্ষদ। গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে সংঘ দীর্ঘদিন জড়িয়ে থাকলেও সংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সরাসরি পরিচালনায় সার্বিক পল্লী সংগঠন সম্পর্ক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করেন তিনিই। গ্রামের মানুষের আর্থিক স্বনির্ভরতা, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার কথাও তিনি ভাবতেন, 'পল্লী মঙ্গল' এবং 'গ্রামশ্রী' কর্মসূচী করেন তিনি, রামকৃষ্ণ সংঘকে নানা দিক থেকে শক্তিশালী করার জন্য নানা কর্মসূচী নেন তিনি। বয়সের ভারকে অগ্রাহ্য করে তিনি ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে প্রতিটি কেন্দ্রে একাধিকবার গেছেন। পশ্চিমবঙ্গে মনসাদ্বীপ ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রে তাঁর যাতায়াত ছিল প্রায় নিয়মিত। প্রতিটি কেন্দ্রের কাজ সম্পর্কে তিনি রাখতেন খোঁজ খবর, দিতেন প্রয়োজনমত নির্দেশ পরামর্শ।

"মানুষের জন্য, বিশেষতঃ দুঃখী, অসহায়, দুর্বল মানুষের জন্য, সর্বোপরি মেয়েদের জন্য তাঁর যে দরদ, মমতা ও সহানুভূতি দেখেছি তা আমাকে স্পর্শ করেছে। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সম্পর্কে সংঘের এক প্রবীণ সন্ন্যাসীর বিশ্লেষণটি প্রণিধান যোগ্য।

কাজ—কাজ—আর কাজ। তারই মধ্যে বিশ্রাম পায়নি তাঁর লেখনী, ক্লান্তি

দেননি অধ্যয়নে। এরই মধ্যে করেন তিনি কয়েকখানি অসাধারণ গ্রন্থ এবং শাস্ত্রাদির টীকার প্রাঞ্জল ইংরেজি অনুবাদ। সেসব গ্রন্থের মধ্যে আছে শঙ্করাচার্য কৃত ব্রহ্মভাষ্যসূত্র, শ্রীধরস্বামী কৃত গীতার টীকা প্রভৃতি। তাঁর 'স্পিরিচুয়াল আইডিয়াল ফর দি প্রেজেন্ট এজ', 'আওয়ার ডিউটি টুওয়ার্ডস দি মাদার ল্যাণ্ড', 'ধর্ম ও ধর্ম-জীবন','ভগবান লাভের পথ' প্রভৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর মননশীলতা, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা। এসব বই সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর ইংরেজি, সংস্কৃত, কোঙ্কনি, বাংলা ইত্যাদি ভাষার দক্ষতার কথা।

রসবেত্তা এই সাধক তাঁর ব্যাধি নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়েননি। চরম মুহূর্তেও রসিকতার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন সবার বিষণ্ণ মনকে আনন্দে। তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ার পর যখন তাঁকে বলা হ'ল, চিন্তার কিছু নেই, ডাক্তার তো বলছেন, সমস্ত অরগ্যান ভালই আছে। বীরেশ্বরানন্দজী হেসে বললেন, অল অরগানস আর গুড। তবে শোন একটা গল্প। একজন একটা গাড়ি কিনতে গিয়ে দোকানদারকে বললেন, আমাকে এমন একটা গাড়ি দিন যার অল পার্টস আর ইকুয়ালি গুড। গাড়ি কিনে ভদ্রলোক নিজেই তা চালিয়ে ফিরছেন। কিছুদূর যাবার পর গাড়ির চারটে চাকাই ছিটকে বেরিয়ে গেল। কোনরকমে বেঁচে গিয়ে ভদ্রলোক রেগে-মেগে দোকানে এসে বললেন, কি মশায়, আমি যে বারবার বললাম এমন গাড়ি দেবেন যার অল পার্টস আর ইকুয়ালি গুড। দোকানদার বলে, আমরা তো সেরকম গাড়িই দিয়েছি। অল পার্টস যদি ইকুয়ালি গুড না হত তবে গাড়ির চারটি চাকা কিভাবে একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। তা আমার হয়েছে সেই অবস্থা।